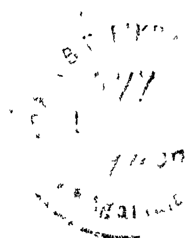
মনে মনে

সত্যব্রত মৈত্র



মুখার্জ্জী বুক হাউস
৫৭, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

প্রথম প্রকাশ
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৫

প্রকাশক
সুবিমল মুখোপাধ্যায়
মুখার্জ্জী বুক হাউস,
৫৭নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট
চিত্রবিতান

মুদ্রক
সমরেন্দ্র ভূষণ মল্লিক
বাণী প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট মুদ্রক
আই. এন. এ. প্রেস
১৭৩, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

দাম দু' টাকা

ভূমিকা

আজকাল কোনো বইয়ের ভূমিকা লেখা, বিশেষ করে উপন্যাসের যৌক্তিকতা আছে কিনা জানিনা। তবুও প্রকাশকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি।

বইখানা ছোট। কিন্তু বিষয়বস্তুর মূল্য আছে। কিছু কাল আগেও আমাদের তথাকথিত আল্ট্রামডার্ণ সোসাইটিতে যে দ্বন্দ্ব দেখেছি তারি রূপকে কয়েকটা আঁচড় দিয়ে টেনে দিয়েছি। অনেকের ধারণা মোটা বই না হ'লে মান বাড়ে না। এ বিষয়ে আমার মত আলাদা। যে দেশে এখন চাল-ডালের সমস্যাই প্রধান সেখানে স্বল্প মূল্যের বইয়ের প্রয়োজন বেশী। অর্থাৎ যাতে রথ দেখা আর কলা বেচা দুয়ের কাজ হতে পারে।

এ উপন্যাস সম্পর্কে একটি কথা মনে হচ্ছে। সেটি না বলে উপায় নেই। আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় পবিত্র দা (গঙ্গোপাধ্যায়) একদিন আমায় বলেছিলেন কচু গাছ কাটতে কাটতে ডাকাত হয়।

বসে বসে তাই কচু গাছ কাটছি ডাকাত কবে হবো পাঠকেরাই ভালো বুঝবেন। ইতি—

২৫শে বৈশাখ

১৬২, জপুর রোড্

কলিকাতা ৩০

সত্যব্রত মৈত্র

লেখকের অন্যান্য বই

বনদুহিতা (উপন্যাস)
দিক্‌দিগন্ত (ঐ)
ড্রয়িংরুম্‌ (গল্প)

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রদ্ধাভাজনেষু

মনে মনে

টিপ্ টিপ্ করে তখনও ছু' এক ফোঁটা বৃষ্টি ঝরছিল। প্রবল বর্ষণের সমারোহ সারা আকাশে। এ অঞ্চলের খ্যাতনামা অত্যাধুনিক কেতাদুরস্ত সুধাংশুবাবুর বাড়ীর একটি ঘরে তানপুরায় গলা সাধছিল তাঁর মেয়ে লীনা। জানালার শার্সিগুলোতে বৃষ্টির ছিটেফোঁটা লেগে রয়েছে। বাইরের আবহাওয়াতে ঘরের ভেতর লীনার কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে রহস্যময়।

সুধাংশুবাবু মন্থর গতিতে ঘরে ঢুকে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, বেড়াতে যাবে না? মুখখানা গম্ভীর করে উত্তর দিল লীনা, দেখছ না বৃষ্টি পড়ছে।

বাইরের দিকে চোখ মেলে সুধাংশুবাবু বললেন, অতুল তোমায় অনেকদিন দেখেনি, সেদিন বারবার করে ব'লে দিয়েছে।

লীনা উত্তর দিল, অন্য একদিন যাবো; আজ ভাল লাগছে না।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সুধাংশুবাবু ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। তাঁর চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই লীনার কণ্ঠস্বর থেমে গেল। গাড়ী-বারান্দার নীচে চক্‌চকে সেভ্রলেখানা দাঁত ঘসে দাগ কেটে যায়। খানিক বাদেই সিঁধেল চোরের মত পা টিপে ওয়াটারপ্রুফ গায়ে অখিল এসে ঘরে ঢুকল।

লীনা আনমনা হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল, অখিল চট্ করে পেছন থেকে লীনার চোখ ছুটো টিপে ধরে।

আচমকা হাতের স্পর্শে আঁটসাঁট হ'য়ে বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করে লীনা, কে? উঃ হাত ছুটো কি ঠাণ্ডা বাপ্‌রে।

প্রচণ্ড হাসিতে অখিল ঘরখানা কাঁপিয়ে তোলে।

দাঁড়িয়ে রইলেন যে? লীনার স্বরে স্বর্গের সুষমা যেন ঝরে পড়ে! সামনের ব্রাকেটে অখিল ওয়াটারপ্রুফটাকে ঝুলিয়ে দিল।

লীনার সারা শরীরে কিসের যেন দোলা লেগেছে। তার পেলব তনু মাঝে মাঝে থর থর কেঁপে ওঠে। অখিলের দিকে চেয়ে সে বলে, বসুন না। চেয়ারের উপর বসে নিঃশব্দে অখিল তাকিয়ে থাকে।

চোখে তার অনেক প্রশ্নই লুকিয়ে রয়েছে। জানালার কাছে আবার ফিরে এল লীনা। বন্ধ শার্সিগুলো এক এক করে সে খুলে দিল। ঘরে বাইরের ঠাণ্ডা খোলা হাওয়া গুমোট ভাবকে ঝরঝরে করে দিল। কিন্তু লীনার চোখের সামনে জমাট অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে থাকে। নিজের মনের ভেতর প্রকাণ্ড এক পাথর চাপা দিয়ে বাইরের রাজপথের দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। কোন কথাই তার মুখ দিয়ে সরছে না।

অখিল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। এক-পা দুই-পা করে এগিয়ে চলে বাইরের দিকে। ঘাড় ফিরিয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে লীনা প্রশ্ন করে, চলে যাচ্ছেন বুঝি?

—হ্যাঁ। কাঁধের উপর ওয়াটারপ্রুফটাকে ফেলে অখিল বলে, তোমার বাবাকে দেখছি না তো?

—অতুলবাবুর ওখানে গেছেন।

—তুমি গেলে না?

—না।

—আমার জন্য বুঝি?

—হ্যাঁ।

সারা ঘরখানার থমথমে আবহাওয়া লীনার উত্তরটুকু কেন্দ্র করে আরো স্তব্ধ হয়ে আসে। অখিল শুধায়, কিন্তু কেন?

ক্রুদ্ধা ফণীনির মত লীনা আবার জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। ঘরের রুদ্ধ বাতাস দূরে ঠেলে দেবার জন্য সব কয়টা শার্সি সে আবার বন্ধ করে দিল। চট্‌পট্‌ জানালার শার্সিগুলো বন্ধের শব্দে তার প্রচ্ছন্ন মনের অভিব্যক্তি ধরা পড়ল।

পরিস্থিতি সরল, সহজ ও সুন্দর করে তোলবার জন্য দেয়ালের গায়ে ঝোলান তানপুরাকে অখিল নামিয়ে আনে।

লীনা বলে, আবার ওটি দিয়ে···

তার কথার মাঝখানে দীর্ঘ একটা ছেদ টেনে অখিল উত্তর দেয়, যদি···।

অন্যদিন হলে লীনা অবশ্য অখিলকে কখনই দুবার অনুরোধের সুযোগ দিত না। আজ তার মন বিপরীত-ধর্ম্মী। আকাশের কালো মেঘে সে নিজেকে লুটিয়ে দিয়েছে।

লীনা উত্তর দিল না।

অখিল উত্তর দেয়, তোমার এ রূপ যেমন বিস্ময়কর আবার তেমনি বৈচিত্র্যময়।

পরনের তাঁতের শাড়ীর আঁচলখানি খালি পাক দেয় লীনা।

তানপুরায় মৃদু আঘাত দিয়ে অখিল প্রশ্ন করে, বলতে পারো মানুষের সুখের উৎসমুখ কোথায় ?

এখুনি হয়ত লীনা মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। ভূমিকম্প নয় ত ? সারা পৃথিবী কাঁপছে যেন। উত্তর দিতে গিয়ে কোথায় সব আটকে যায়। কিন্তু তার উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই অখিল আবার বলে, হয়ত বলবে ভালবাসা। কিন্তু জানো লীনা, পৃথিবীর চলার ছন্দ ?

—হ্যাঁ জানি।

—আমিও জানি। তবে তার শেষ কোথায় বলতে পারো ?

ঘরের মেঝেয় পা ঘসে লীনা উত্তর দেয়, হঠাৎ আজ এ কথা কেন?

ঘরের ভেতরে মাঝখানে একটি টেবিল। টেবিলের উপর কাঁচের পুষ্পাধারে কয়েকগুচ্ছ ফুল হেলে পড়েছে। একটি ফুল হাতে নিয়ে লীনা বলে, কি সুন্দর! আবার একে গাছ থেকে চয়ন করতে কত কাঁটার আঁচড় লেগেছে দেখবে? ডান হাতের কব্জীতে কয়েকটি আঁচড় অখিলকে দেখাল সে।

—না তুললেই পারতে, বলে অখিল।

একটা চেয়ারে বসে লীনা বলে, বেশ বললে! না তুললেই পারতাম—ফুল মানুষের প্রিয়। তাকে মুঠোর মধ্যে আনতেই না এই আঁচড় লেগেছে!

লীনার সব কয়টি কথা তলিয়ে দেখবার জন্য অখিল চেষ্টা করতে থাকে। লীনা ভেবেছিল, তার কথা বলার পর হয়ত ভাষার প্রস্রবণে অখিল তাকে ডুবিয়ে দেবে। তা হোল না। সমস্ত জবাব দেয় অখিল একটিমাত্র দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে।

বৃষ্টির ধারা অনেক আগেই থেমে গেছে। এক টুকরো কালো মেঘের ফাঁকে ত্রয়োদশীর চাঁদ ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে। তার কিরণের ছোঁয়া লাগল কাঁচের জানালাতে। অখিলের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল লীনা।

সে বলল, আজ তোমাকে অন্যমনস্ক দেখছি।

—ও কিছু নয়। শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে এমন ঠেকছে, উত্তর দিল অখিল।

অখিলদের বর্ত্তমান পারিবারিক অবস্থায় কেউ কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে তার সুচিকিৎসা হওয়া সম্ভবপর কিনা এ আশঙ্কা স্বভাবতই করা যেতে পারে। লীনার বেলাতেও তার ব্যত্যয় ঘটল না। ডাক্তার নাকি রায় দিয়েছেন অখিলকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য, নৈলে

ভবিষ্যতে কঠিন রোগে আক্রান্ত হবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা। ডাক্তারের রায় হয়ত ঠিক, কিন্তু বিধাতা সকলকে সব সুখ সুবিধা ভোগ করতে পৃথিবীতে পাঠান নি।

একটা ঘড়ির চমৎকার ঝঙ্কারে রাত আট-টা বাজবার কথা স্মরণ করিয়ে দিল। সুধাংশুবাবুর ফেরার সময় হয়ে আসে। তিনি সন্ধ্যার দিকে বাইরে ঘণ্টা দুয়েকের বেশী থাকেন না। গাড়ীবারান্দার তলে মোটরের হর্ণ বেজে ওঠে। লীনার চোখের দৃষ্টি আনত হয়ে আসে। নিঃশব্দে অখিল চলে যায়। গাড়ীবারান্দার পাশ দিয়ে চলে যেতেই মোটরে চাবি লাগাতে লাগাতে সুধাংশুবাবু একবার আড়চোখে অখিলকে দেখে নিলেন।

সুরূপা অর্থাৎ সুধাংশুবাবুর স্ত্রী গাড়ীবারান্দার সামনে এসে দাঁড়ান। ঠাণ্ডা লাগলেই সর্দ্দি হবার ভয়ে আজ আর স্বামীর সাথে বের হন নি'। লীনাও নেমে এসেছিল মায়ের পেছনে পেছনে। গট্‌গট্ করে সুধাংশুবাবু উপরে উঠে এলেন। সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে তিনি যেন একটা ধমকের ইঙ্গিত দিয়ে যান। অখিলের এখানে সবচেয়ে বড় আশ্রয় ছিল সুরূপা দেবী। কেন যেন এই ছেলেটিকে অন্তর থেকে তিনি মুছতে পারেন নি। হয়ত পুত্র কামনায় ভাগ্যহীনা নারীর সহজাত মমত্ববোধে।

বাবার পিছু পিছু লীনা ঘরে ফিরে এসে খাতার উপরে কি যেন লিখছিল।

পরনের দামী শাড়ীখানা পাল্টে কিছু পরে সুরূপা এসে ঢুকলেন মেয়ের পড়বার ঘরে। আশা করেছিলেন অখিল হয়ত এখনও গল্প-গুজব করছে। সে থাকা পর্য্যন্ত তিনি আজ একবারও আসতে পারেন নি। স্বামীর রাত্রের খাবারের আয়োজনের জন্য বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। ব্যস্ততার কোন কারণ নেই। তবুও বাদলার দিনে কিছু রুচি পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন বোধ করেই তিনি স্বহস্তে সব ব্যবস্থা করেছিলেন আজ।

সুরূপা বলেন, অখিল চলে গেল—তাকে একটিবারও দেখতে এলাম না। কিছু বলিস নি তো? ও যেন আজকাল কেমন হয়েছে। দু' দণ্ড বসতে বললেই নানা অছিলা দেখায়।

মায়ের কথার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে লীনা উত্তর দেয়, মিছেই তুমি বকছ। মেয়ের ভাব-গম্ভীর মুখ দেখে সুরূপা ঘর থেকে বাইরে এলেন। মা চলে যাবার পর লীনা অনেকক্ষণ ধবে বাইরের রাজপথের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মনে হোল সারা পৃথিবী যেন আজ গৈরিক বসন সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করেছে।

যেমনটি হয়ে থাকে। পাশাপাশি দুখানা বাড়ী। এ অঞ্চলে তখনও লোক সমাগম হয়নি। ক' ঘব লোকেব বাসস্থান অনায়াসেই আঙুলে গোনা যায়। কয়েকটি বাড়ী তখনও মাথা তুলে দাঁড়ায় নি। সবে মাথা তুলতে চায়। অখিলেব বাবা অক্ষয়বাবু মাথা গুঁজবার জন্য কোন বকমে নিজের সংস্থান করলেন, উপবে টিন, ইটের দেয়াল।

মোটা টাকাব মালিক সুধাংশুবাবু। একেবাবে দোতলা হাকালেন। ক্রমে ক্রমে দুটি পরিবাবের মধ্যে আলাপ ঘনিয়ে উঠল এবং অবাধ যাতায়াতের ফলে কালক্রমে বিরাট ফাটল ধবল সুধাংশুবাবুর অত বড় দোতলায়। চূণ আব বালি দিয়েও তা রোধ কবা গেল না। ঝুরঝুর করে চূণ আর বালি খসে পড়ল।

দুই

বিকালের আড্ডা বেশ জমে উঠেছে। বন্ধু-বান্ধবদের হাসি-ঠাট্টায় বৈঠক প্রাণবন্ত। অতুল গুপ্তের বৈঠকখানায় একখানা ফরাস পাতা। সুধাংশু সেনের অন্যতম বিশিষ্ট বন্ধু অতুল গুপ্ত। দিনান্তে কাজের শেষে এখানে অনেকেই এসে থাকেন। মোটর হাঁকিয়ে সুধাংশুবাবুও আসেন।

—গুড্ ইভনিং মিঃ সেন। সহাস্যে অতুল উঠে দাঁড়ান। সকলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সুধাংশুও প্রতি নমস্কার জানালেন।

অতুল বললেন, লীনা এলো না—

—দেখতেই পাচ্ছ, জবাব দেন সুধাংশু।

অতুলের আহ্বানে ক্যাবলা এসে দাঁড়াল।

অনেকদিনের পুরোনো চাকর।

অতুল বললেন, শোন্ মাইজীরা কেউ বাসায় নেই—আর তোকে দিয়েও হবে না। যা সামনের দোকানে কয়েক পেয়ালা চায়ের কথা বলে আয়।

প্রভুর আদেশে কাঁধের গামছাখানাকে নীচের দিকে টেনে ক্যাবলা চলে যায়। দশমিনিট পরেও ক্যাবলার ফিরবার কোন লক্ষণ না দেখে অতুল দরজার সামনে এসে বাইরে উঁকি মারলেন।

—ছট্‌ফট্ করছ কেন? স্থির হয়ে বসে থাকা তোমার ঠিকুজীতে লেখোনি বুঝি, বললেন সুধাংশু সেন। আড্ডার জনৈক বন্ধু সুধাংশুর কথার সমর্থন জানালেন; যা বলেছেন।

—ব্যাটা গেল কোথায়? জ্বালিয়ে মারল দেখছি, অতুল গিয়ে পথে নামলেন।

বাইরে থেকে গর্জ্জন শোনা গেল; ব্যাটা নিশ্চয় মেধো গেঁজেলের দোকানে আড্ডা মারছে! আসুক না একবার হাড় গুঁড়ো করে দেব। ক্ষিপ্র গতিতে অতুল ঘরের মধ্যে ফিরে এসে ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। অপর দরজা দিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ক্যাবলা ফিরে এল। তড়বড় করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন অতুল। হতভাগা এতক্ষণ কোথায় ছিলি? হতভাগার মুখ থেকে পরিষ্কার কিছু শোনা গেল না। প্রভুর হুঙ্কারে তার শরীর কাঁপতে থাকে বলির পাঁঠার মত।

জড়িতস্বরে ক্যাবলা উত্তর দেয়; আজ্ঞে—।

—আবার আজ্ঞে। হাড় গুঁড়িয়ে দেব।

ক্যাবলা বিরাট একটা হা করে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল।

—হাবা গঙ্গারামের মত দাঁড়িয়ে কি দেখছিস। এখান থেকে বিদেয় হ, গর্জ্জে ওঠেন অতুলবাবু—।

বিনীতভাবে ক্যাবলা জিজ্ঞাসা করল, আজ্ঞে যাবো?

—যাবি না ত কি আমাদের হা করে গিলবি?

কম্পিত কলেবর ক্যাবলা প্রস্থান করল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রির কালো ছায়া নেমে এল শহরের বুকে। সুরু হোল রহস্যময়ী নগরীর বিচিত্র জীবন। দেয়ালের ঘড়িতে ঢং ঢং করে নটা বাজল। একটা সিগারেট জ্বালিয়ে অতুল গুপ্ত এবং অন্যান্য বৈঠকীদের অনুমতি নিয়ে সুধাংশু সেদিন আগে ভাগেই আড্ডা ত্যাগ করলেন।

তিন

বাইরে একটা বেঞ্চ পাতা। টিনের দোচালা ঘর। টালির বারান্দা। অক্ষয় বাবু একখানা দৈনিক কাগজে মন দিয়ে কি যেন দেখছিলেন। ঘরের ভেতরে একটি টেবিলের উপর মুখ বুঁজে অখিল পড়ছিল একখানা বই। হঠাৎ অখিল বই বন্ধ করে জামার বুক পকেটে হাত দিয়ে আপন মনেই বলে ওঠল, আমার ফাউন্টেন পেনটা দেখছি না যে!

সে একটানে দেরাজটা ফেলল খুলে। টেবিলের দেরাজটা খুলবার সাথে সাথে ওর চোখ দুটো স্থির হয়ে এল। টেবিলের দেরাজে খামের একটি চিঠি পড়ে আছে। চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পড়ে নিয়ে অখিল ভাবে,. এবার চিঠিখানার উত্তর দিলেই হয়। ওর নজরে পড়ে ফাউন্টেন পেনটা চেয়ারের তলে পড়ে আছে। মাথা নত করে সে পেনটা তুলে নিল। উষা এসে ঘরে ঢুকলেন।

—হ্যাঁরে অখিল; কি করছিস বল ত?

অখিল উত্তর দিল, এই হিজি বিজি কত কি। দেরাজের চিঠিখানা অখিল মুঠোর মধ্যে লুকিয়ে রাখল।

উষার নজর পড়ল চিঠিখানার উপর। বল্লেন, দেখি ওটা কি?

—কিছু না। একটা গল্প লিখছিলাম ; শুনবে?

—গল্প লিখবার কি আর সময় নেই ; কটা বাজতে চলল?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জবাব দিল অখিল, সবে এগারো।

উষা হাসলেন, তোকে নিয়ে আর পারি না।

ফাউন্টেন পেনটিকে ড্রয়ারের মধ্যে রেখে অখিল উত্তর দেয়, কবেই বা আমার সাথে পারলে? তারপর একটু থেমে আবার বলে তোমার কি দরকার বল না শুনছি।

ক্ষণকালের জন্য দাঁড়িয়ে উষা বলেন, ওঁর সাথে একবার দেখা করিস। ঘাড় হেঁট করে অখিল কথাগুলো শুনল। উষা বের হয়ে গেলেন।

বইপত্তর গুছিয়ে রেখে অখিল ভাবল, নিশ্চয়ই তার বাবার মাথায় কোন ফন্দি গজিয়েছে, নৈলে এখন আবার ডাকাডাকি কেন। দেরী হলে অনেক কিছু শুনতে হবে ভেবে সে তাড়াতাড়ি বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। অক্ষয় খবরের কাগজখানা নামিয়ে ছেলের মুখের দিকে চাইলেন।

—হ্যাঁ তোমায় ডেকেছিলাম, অক্ষয়ের গাম্ভীর্য্যে প্রমাদ গণল অখিল।

—বলুন। বাবার পাশে বসল অখিল।

—অনেক কথা আছে। বড় হয়েছ। তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজ করা ঠিক নয়। সরে বসলেন অক্ষয়।

অখিল মুখ নিচু করে উত্তর দিল, হঠাৎ একথা কেন বলছেন? আমি কী কোন অন্যায় করেছি?

মাথা নেড়ে চোখের চশমা নামিয়ে অক্ষয় বললেন, ন্যায় অন্যায় তোমরাই ভাল বোঝ—আমরা বুড়ো হয়েছি—তোমরা এখনও যুবক, সম্মুখে তোমাদের কত আশা।

বেঞ্চ থেকে উঠে অখিল বারান্দার শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল।

অক্ষয় বললেন, কি চলে যাচ্ছ নাকি ?

উল্টোমুখো অখিল উত্তর দিল, না।

—এদিকে শোনো। অক্ষয়ের মুখে সুগভীর ক্লান্তির ছাপ।

অখিল ফিরে চাইল তার বাবার দিকে।

—পাটনা থেকে একজন ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের সাথে তোমার বিয়ের প্রস্তাব করে চিঠি দিয়েছেন। ঊষা এসে দাঁড়ালেন ঠিক তখুনি। ছেলের বিয়ে দেবার প্রচুর আগ্রহে মায়ের মনে বেজায় আনন্দ উথলে উঠেছিল। স্বামীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, জানতাম ও রাজী হবে। মুখ ফিরিয়ে সোজা তাকাল অখিল, কি বলছ মা ? ফতুয়ার পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে অক্ষয় উত্তর দিলেন, ঠিকই বলেছেন।—তাঁর একটি মেয়ে আছে। লেখাপড়া বেশী করে নি। আমার ইচ্ছাও ঠিক তাই। লেখাপড়া শিখলেই মেয়েরা যেন কেমন হয়ে যায়। ঘর সংসারের কথা মনেই থাকে না।

অখিল বারান্দায় পায়চারি করতে থাকে। বাবার কথা তার ভাল লাগল না। কথাটা মোটেই ঠিক নয়। অখিল বলল, লেখাপড়া শিখতে পেলে মেয়েরা সত্যিকারের নারী হয়ে উঠতে পারত।

অখিলের কথার প্রতিবাদ করলেন ঊষা, বললেন, বলিস কি—তবে শোন। চোখের উপরেই ত দেখলাম অণিমা বি-এ পাশ করে কি যেন হয়ে গেছে। তার চলন বলনে সংসার পালন করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও দেখিনা। কেন বাপু এসব ?

অখিল উত্তর দেয়, দরকার আছে বলেই এসব করছে। চিরকাল কি মেয়েদের পরের উপর নির্ভর করেই চলতে বলো ?

মাতাপুত্রের তর্কের মধ্যে ভদ্রলোকের কাছে চিঠির উত্তর দেওয়ার মত কিছুই খুঁজে পেলেন না অক্ষয়বাবু। তবুও তিনি ছেলেকে প্রশ্ন

করলেন ; তোমার মতামত জানতে পারলেই ভদ্রলোককে চিঠি দিতে পারি—চিঠির উত্তর না দেওয়াটা কি ভালো দেখায় ?

মৃদু হাস্যে অখিল উত্তর দিল ; বেশ ত'। যা হয় আপনারা একটা দিয়ে দিন। এর চেয়ে বেশী বলা তার পক্ষে বাপের সামনে খুবই লজ্জার বিষয়।

অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন অক্ষয়। মনে মনে তিনি বুঝতে পারেন, এ-যুগের আবহাওয়ায় মানুষ হলেও ছেলে তার মা বাপের অবাধ্য হবে না। একটু চুপ করে থেকে অক্ষয় আবার বললেন, তাহলে ভদ্রলোককে লিখে দি' তাঁরা এসে ছেলে দেখে যেতে পারেন। স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আবার তিনি বললেন, কি বলো তুমি ?

ছেলেব দিকে উৎফুল্লভাবে তাকিয়ে উষা উত্তর দেন, দিন টিন—।

অখিল মুখ ফিরিয়ে বলল, এ সবের কোন অর্থ ই খুঁজে পাচ্ছিনা। অক্ষয় আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, পাচ্ছ না—মানে ? তোমার নিজের কথারও কোন দাম নেই দেখছি।

—দাম আছে বলেই বলছিলাম।

—দাম আছে বলেই বলছিলাম ! রাগে অক্ষয়ের শরীর রী রী করতে থাকে।

—তবে তুমি বিয়ে করবে না ?

—না।

এতদূর স্পষ্টোক্তি ছেলের কাছ থেকে অক্ষয় আশা করতে পারেন নি।

—বেশ। তোমার যা ইচ্ছে তাই করগে। তোমাদের মনের ভাব বুঝতে আমাদের এই পাকা চুলের বেশী দেরী হয় না ; স্ত্রীর দিকে তিনি একবার রুষ্ট ভাবে তাকালেন, বললেন, চলো। এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও পাপ।

ক্রোধে বেগে একসঙ্গে স্বামী ও স্ত্রী স্থান ত্যাগ করলেন।

ওঁদের চলে যাবার পর অখিল বারান্দার বেঞ্চটার উপর বসে গালে হাত দিয়ে ভাবতে থাকে। এলোমেলো কত চিন্তাই তাকে ঘিরে রয়েছে। বড় অসহায় মনে হয় এক এক সময় নিজেকে। বেঞ্চের এককোণে খবরের কাগজখানা পড়েছিল। সেটাকে সে তুলে নিয়ে মনকে সংযত করবার চেষ্টা করে। ধীরে ধীরে তার চোখের পাতা দুটো বুঁজে আসে কাগজ পড়তে পড়তে।

হঠাৎ বাড়ীর চাকর রামধনি ডাক দেয়, দাদাবাবু—।

এক ডাকে অখিলের তন্দ্রা দূর হয় না। রামধনি আবার ডাকল, দাদাবাবু শুনছ—?

তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে অখিল উত্তর দেয়, যা, বাজে বকিস না। রামধনি একখানা চিঠি অখিলের দিকে এগিয়ে দেয়। অখিলের তন্দ্রা টুটে যায়। দাদাবাবুর হাতে চিঠি দিয়েই রামধনি চলে গেল। চোখ দুটো দুহাত দিয়ে রগড়ে নিয়ে অখিল চিঠিখানা অনেকক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে পড়তে থাকে।

চিঠি পড়া শেষ করে সে ঘরের মধ্যে ঢুকল। আনলা থেকে সার্টটি নিয়ে গায়ে লাগাতেই অপর দরজা দিয়ে ঘরের ভেতর তার বাবা ঢুকলেন।

—এখন—এই দুপুরে? বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন অক্ষয়বাবু।

অখিল একটু দাঁড়াল। কিন্তু কোন কথা বলল না। তারপর একপা দুইপা দরজা পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়ে উত্তর দিল, একটু বিশেষ দরকার আছে। ফিরতে দেরী হবেনা।

অক্ষয়ের কাছে আজ অখিলের ভাবধারা ক্রমশই ঘোলাটে হয়ে উঠল্। গম্ভীর স্বরে হাঁক দিলেন, রামধনি, ভেতরে তামাক দিয়ে আয়।

চার

সুধাংশু সেনের বাড়ীর সামনে লীনা বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার দিকে তাকালেই বোঝা যায় কোন এক অজানা আশঙ্কায় সে কেমনধারা হয়ে গেছে। অজস্র ফুল থোকা থোকা ধরে আছে বাগানের ভেতরে। লীনা গিয়ে দাঁড়াল একটি ফুল গাছের কাছে। একটা পাখী শিস্ দিচ্ছিল। লীনা দাঁড়াতেই পাখীটি উড়ে গেল। মৃদু গুঞ্জন ধ্বনির সাথে একটা ফুল হাতে নিয়ে বাগানের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত লীনা আনমনা চলতে থাকে। দূর থেকে সুধাংশু সেনের বাড়ীর ফটক পর্য্যন্ত এসে অখিল চুপ করে থাকে দাঁড়িয়ে। লীনার গুঞ্জনধ্বনি শুনে সে কান খাড়া করে থাকে। লীনার গানের দু একটা কলি আয়ত্ত করে অখিল ফটকের পাশে আত্মগোপন করে নিজেও নীচু গলায় সুর ভাঁজল। কারও কণ্ঠস্বর শুনে লীনা নিজেকে বিব্রত বোধ করে। সে একবার পিছন ফিরে তাকায়। ছম্‌ছম্ করতে থাকে তার গা। সামান্য একটু চিন্তা করে লীনা হেসে উঠল, অখিল-দা বুঝি। ফটকের পাশ থেকে অখিল এল বাগানের ভেতরে।

লীনা বলল, কি ভয় যে আমার করছিল। অখিল ধীরে ধীরে তার হাতটা এগিয়ে দেয়, তাই নাকি? আমারও কিন্তু ভীষণ ভয় হয়েছিল। বাগানের ভেতর ফুলপরী এল নাকি, কি মিষ্টি সুর!

লীনার সমস্ত অন্তর যেন মত্ত দক্ষিণা হাওয়ায় দুলে উঠল। ভুলে গেল সে সব কিছু। তাড়াতাড়ি চলতে চলতে বলে, এসো শিগগির, বেড়াতে যাবো।

অখিল বলে, দৌড়াচ্ছ কেন? অত তাড়াতাড়ি আমি পারি না।

লীনা এক দৌড়ে ঘরে গিয়ে প্রথমে ঢুকল। তার পেছনে একটা চেয়ারে বসে অখিল হাঁপ ছেড়ে যেন বাঁচে; পাখাটা চালিয়ে দাও। উঃ, এ যেন সাক্ষাৎ এটালান্টা।

পাখাটার সুইচ টিপে দিয়ে লীনা উত্তর দেয়, একটু বসো, আসছি।

অখিল যে ঘরে বসেছিল তার দেয়ালে কয়েকটি ফটো ঝুলছে। টেবিলেব উপর রাখা শ্রীমতী লীনার একখানা অর্দ্ধাবয়ব সুন্দর প্রতিকৃতি কাঠের ফ্রেমে বাঁধান। ফটোটির দিকে খানিকক্ষণ অখিল তাকিয়ে রইল। পেছনে ফেলে আসা এক ফালগুনী পূর্ণিমার রাতের কথা মনে পড়ে অখিলের। সেদিনও ঠিক এমনি চাঞ্চল্য ছিল লীনার প্রতি কথায়। মুহূর্ত্তের মধ্যে অখিলের চিন্তা বাধা প্রাপ্ত হোল লীনা ঘবে ঢুকতেই।

অখিলের চোখের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে তন্বী লীনা। সম্বিত ফিরে পেয়ে অখিল জিজ্ঞাসা করে, হাসছ যে ?

—বারে হাসব না ? জীবনটা কি কাঁদবার জন্য ?

অখিল উত্তর দিল, না সে কথা বলছি না। তবে কি জানো অনেক সময় হাসির ভেতরেও কান্না মেশান থাকে—নয় কি ?

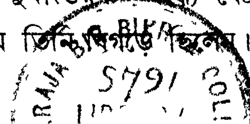
—আচ্ছা ওকথা থাক ; লীনা অন্য একটি ঘরের ভেতর গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একবার নিজেকে ভালো করে দেখে নেয়।

বাড়ীর বাইরে ফটকের সামনে মোটর থামার শব্দ হোল এরি মধ্যে।

অখিল বলল, বুঝেছি। তোমার বাবা এলেন।

মুখ ভার করে লীনা। হতাশার ম্লান রেখা ফুটে উঠল তার চোখেমুখে। পূর্ণ চাঁদের উদয় না হতেই ঘোর অমাবস্যার তিথি দেখা দেয়। সুধাংশু সেন তাঁর বাড়ীতে অখিলের যাতায়াত পছন্দ করতেন না। শুধু সুরূপা দেবীর জন্য কিছু মতামত প্রকাশ করতে পারতেন না। কোনদিন মুখে কিছু না বললেও আজকে তার ব্যতিক্রম ঘটল।

মেজাজও ঠিক ছিল না সুধাংশুর। সান্ধ্য বৈঠকে তিনতাসে কয়েক বাজিতে লোকসান দিয়ে তিনি বিগড়ে ছিলেন। ঘরের মধ্যে



ঢুকেই আড়চোখে একবার অখিলের দিকে চাইলেন। অখিল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দিগন্তব্যাপী সমুদ্রের মাঝে যে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাসিয়ে দিয়েছে, সামান্য ঘূর্ণীবায়ুর আকস্মিক দাপটে তার মনে কোনও ভাবান্তর ঘটাতে পারল না।

সুধাংশু বললেন, তারপর কোথায় যাওয়া হচ্ছে? অখিলের মুখ থেকে কোন কথাই সরল না। চুপচাপ ঠিক একভাবে দাঁড়িয়ে রইল। সুধাংশু তার গায়ের কোটটা খুলে দেয়ালের হ্যাঙ্গারের সাথে ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে আবার প্রশ্ন করেন, তোমরা যে সব বোবা হয়ে গেলে?

লীনার প্রতিটি বোমকূপের গোড়ায় নূতন রক্ত সঞ্চালিত হোল। মুখ তুলে জবাব দিল, ভেবেছিলুম বেড়াতে যাবো।

একটি চেয়ার টেনে সুধাংশু বসলেন, কারণ?

—তোমার ফিরতে দেরী আছে ভেবে—

—আচ্ছা। এখনও কি যাবার ইচ্ছা রয়েছে?

—অনুমতি পেলেই।

সুধাংশু এবার সোজা তাকালেন মেয়ের দিকে। অধোবদন লীনা ফাঁপরে পড়ল। তাঁর মেজাজকে সপ্তম থেকে পঞ্চমে দু' ডিগ্রি নামিয়ে আনলেন সুধাংশুবাবু। বললেন, ভাল। কিন্তু গিয়ে কাজ নেই। তার চে' বরং একটু পিং পং খেলবে। এসো।

সুধাংশু মেয়েকে আহ্বান করে কক্ষান্তবে প্রবেশ করলেন।

অখিল বের হয়ে যাবার জন্য ধীরে ধীরে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে দেয়।

অখিলের উপস্থিতি সামান্য বিস্মৃত হয়েছিল লীনা। পরে পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে বলল, চলে যাচ্ছেন। আসুন না, আপনিও খেলবেন।

অখিল উত্তর দিল, তা হয় না। তোমার বাবার অমতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করা যুক্তি সঙ্গত হবে না। লীনার অনুনয় বিনয় উপেক্ষা করে মহানগরীর বৈচিত্র্যময় এক প্রহর রাতে সুধাংশু সেনের বাড়ী থেকে বের হয়ে গেল অখিল।

পাঁচ

রাতের আঁধার কেটে সূর্য্য খানিকক্ষণ আগে উঠেছে। একদিন সকালবেলা ড্রয়িংরুমে বসে সুধাংশু সেন প্রভাতী সংবাদপত্রে চোখ বুলোচ্ছেন। ড্রয়িংরুমের ভেতর খান কয়েক আরাম কেদারা। অনেকগুলো নিরাবরণ নারীর তৈল চিত্র দেয়ালের গায়ে ঝুলান। মাঝখানে টেবিলের উপর সদ্য কেনা একখানা মাসিক পত্রিকা পড়ে আছে। কিছু পরেই ঘরের মধ্যে সুরূপা প্রবেশ করে একটি আরাম কেদারায় নিজের দেহ এলিয়ে দিলেন। পরমুহূর্তে একজন দাসী এসে ঢুকল ড্রয়িংরুমে। তার হাতে একটা ট্রের উপর চায়ের কেটলী ও তুটো চায়ের পেয়ালা। টেবিলের উপর সেগুলো নামিয়ে রেখে সে নিঃশব্দে আবার চলে গেল। আড়মোড়া ভেঙ্গে সুধাংশু স্ত্রীর দিকে চাইলেন, জুড়িয়ে যাবে, দেরী কোরো না।

সুরূপা মুখের উপর উড়ে পড়া এক গোছা চুল বাঁ হাতে সরিয়ে চা তৈরীতে মন দিলেন।

কনডেনসড্ মিল্কের কৌটোর তলদেশ থেকে চামচ দিয়ে তুধ বের করতে করতে সুরূপা বললেন, রোজ বলছি কৌটোর তুধ ফুরিয়ে গেছে আরেকটি নিয়ে এসো······

স্ত্রীকে আর বেশী বলতে না দিয়ে সুধাংশু উত্তর দিলেন, ঠিক আছে। আজই নিয়ে আসব, নিশ্চয়ই নিয়ে আসব।

অনুযোগের সুরে সুরূপা উত্তর দিলেন, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

চায়ের লিকারে চামচ দিয়ে সুরূপা বার কয়েক নাড়া দিয়ে আবার বল্‌লেন, চায়ে ফ্লেবার নেই লিকারও পর্য্যন্ত লাল নয়। সুধাংশু-রসিকতার বয়স পেরিয়ে এলেও এখনও তার কিছুটা পরিচয় রেখেছিলেন। বললেন, কিন্তু তোমার ঠোঁট দুখানা বেশ লাল টুকটুকে। চামচ নাড়ান একটু বন্ধ রেখে সুরূপা তির্য্যক দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে একবার চাইলেন।

সুধাংশু সংবাদপত্রখানা নামিয়ে রেখে বললেন, মুখখানা অত ভার হয়ে উঠল যে ?

কোন কথা না বলে সুরূপা দেবী দুই পেয়ালায় চা ঢাললেন।

একটি চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সুধাংশু বললেন, আজ কিন্তু তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে। সুরূপা অন্য একটি পেয়ালা হাতে নিয়ে উত্তর দিলেন, আর নিজেকে।

চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করে সুধাংশু বললেন, অনেককাল সিনেমায় যাই না। চলো আজ যাওয়া যাক্‌···

সুরূপা উত্তর দেন, মন্দ নয় তবে······।

সুধাংশু বল্‌লেন, লীনার কথা ভাবছ—সে নয় তার মাষ্টারের কাছে পড়াশুনা করবে। লেখাপড়া একদম ছেড়েই দিয়েছে দেখছি ; সামনে এক্‌জামিন।

সুরূপা সংবাদপত্রখানা হাতের মধ্যে নিয়ে উত্তর দিলেন, আর কতকাল পড়বে ? ওর এখন···।

—নিশ্চয়ই যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, তার চেষ্টা করছি।

সুরূপা কিছুক্ষণের জন্য সংবাদপত্রে মন সংযোগ করলেন। সুধাংশু সেফটি রেজর নিয়ে দাড়ি কামাতে বসলেন। সুরূপার মনে যে চিন্তাধারা এতকাল আশ্রয় নিয়ে বসেছিল আজ তার প্রকাশ হোল চায়ের টেবিলে স্বামীর সাথে কথা বলার সময়।

খুব মৃদু অথচ দৃঢ়তার সাথে তিনি বল্‌লেন, আমার কিন্তু অখিলকে বেশ মনে লাগে। দাড়িতে অতর্কিতে টান দিতে গিয়ে গালের এক

জায়গায় সুধাংশুর ছড়ে গেল। তিনি উত্তর দিলেন, আচ্ছা সে সব দেখা যাবে'খন। এই কে আছিস্? ভৃত্য প্রবেশ করল। সুধাংশু বললেন, এসব নিয়ে যা। দাড়ি কামাবার যন্ত্রপাতি এবং চায়ের সরঞ্জামাদি নিয়ে ভৃত্য চলে গেল।

ভৃত্য ঘর থেকে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়ে ঘরে ঢুকল।

আব্দারের সুরে লীনা প্রশ্ন করল, তোমরা নাকি সিনেমায় যাচ্ছ? আমাকে বাদ দিয়েই নাকি তোমরা প্রোগ্রাম করলে?

তোয়ালে দিয়ে মুখখানা মুছে নিয়ে সুধাংশু বললেন, আজ নাই বা গেলে—আর তা ছাড়া সামনে তোমার একজামিন, বুঝলে লীনা, এবার যদি পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করতে পার।

স্ত্রী শেষাংশ জুড়ে দিলেন, তা হ'লে তোমাকে একটা সুন্দর প্রাইজ দেবেন।

সুধাংশু হেসে উঠলেন, আর প্রাইজটাও হবে তোমার মনোমত।

অনেকটা খুসী হল লীনা। মায়ের পাশে এসে সে বলল, সত্যি বলছ মা, আমার মনোমত?

সুধাংশু উত্তর দিলেন, হ্যাঁ সত্যি। আর সেইজন্যেই অখিলের সাথে এ কয়দিন বাজে গল্পে সময় নষ্ট না করে।

দুরন্ত মেঘের আনাগোনায় আকাশে স্বচ্ছ আলোর প্রাচুর্য্য অনেকাংশে স্তিমিত হোল।

লীনা একটু দূরে দাঁড়িয়ে উত্তর দিল, খালি অখিল আর অখিল। অখিলদা তোমাদের ওই মাষ্টারের চেয়েও ভালো পড়াতে পারেন।

সুরূপা এবার মেয়ের কথায় সমর্থন জানালেন, ও ঠিকই বলেছে কথাটা মিথ্যা নয়।

সুধাংশু স্ত্রী ও মেয়ের কথার উত্তর দিলেন বক্রোক্তি করে, চোখে দেখিনি তার বাঁশী শুনেছি।

স্বামীর উক্তিতে বাধা দিয়ে সুরূপা বল্‌লেন, না-না—সত্যিই আমি নিজে শুনেছি। লীনা কোন ফাঁকে এরি মধ্যে ঘর থেকে চলে গিয়েছিল।

সুধাংশু ও তাঁর স্ত্রী ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন সিনেমা দেখার জন্য।

ছয়

লীনার রিডিং রুম। রিডিং রুমের মাঝখানে একটি টেবিল। টেবিলের উপর মাথা ঢাকা একটা নীল বৈদ্যুতিক আলো। টেবিলের দুধারে দুখানা চেয়ার। লীনা একখানা বই হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। একটু পরে বইখানা টেবিলের উপর রেখে সে মাথা নীচু করল। কয়েক মুহূর্ত পরে যখন সে মাথা তুলল তখন তার চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। সে এসে দাঁড়াল ফুলদানীর সামনে। সুন্দর তোড়া সাজানো ফুলদানীর ভেতর। আলগোছে সে তোড়াটিকে হাতে তুলে খুব সোহাগভরে একবার সেটিকে বুকে নিল ছুঁইয়ে।

অসিত ঘরে ঢুকল। লীনা প্রাইভেট টিউটর অসিতকে ঘরে ঢুকতে দেখে ফুলের তোড়াটি আবার রেখে দিল ফুলদানীতে। অসিতের দৃষ্টি এড়াতে পারল না সামান্য ঘটনাকে। একখানা চেয়ারে আসন গ্রহণ করে অসিত প্রশ্ন করল, একেবারে চুপচাপ। কি ব্যাপার? নিজের মনোভাব যথাসম্ভব সংযত করে লীনা উত্তর দিল, এমনি। আজকের দিনটির জন্য একটিবার ছুটি চাই মাষ্টারমশাই। কিচ্ছু ভাল লাগছে না।

অসিত টেবিলের উপর থেকে বইখানা তুলে নিয়ে প্রশ্ন করে, কেন? সাহেবকে দেখছি না যে। কোথায় গেছেন? বাড়ীর ভেতর আর কারও সাড়া না পেয়ে অসিত আবার বলে, মাইজীও গেছেন বুঝি?

ছাত্রীকে আসন গ্রহণ করবার জন্য অসিত ইঙ্গিত জানাল। কোন কথা না বলে সে দাঁড়িয়ে রইল। দেখি কি সব টাস্ক আছে? প্রশ্ন করল অসিত। এবার লীনার কথা বের হয়, রহস্য করবেন না মাষ্টারমশাই। আজ আপনি আসুন। শরীর সুবিধে নেই।

মাথার চুলের ভেতর হাত চালাতে চালাতে অসিত কি যেন বলার চেষ্টা করে। তারপর একটু ইতস্ততঃ ভাব নিয়েই জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু

—কোনো কিন্তু নেই এর মধ্যে। হ্যাঁ, সত্যিই বলছি আজকে আমি নিজেকে কিছুতেই স্থির রাখতে পারছি না।

—অগত্যা আমাকে উঠতেই হবে, কি বলো?

—হ্যাঁ।

মুখ গম্ভীর করে মাষ্টার চলে যায়।

অসিত চলে যাবার পর জানালার সামনে লীনা দাঁড়াল। আজ তার মনে অনেক কথাই দোলা দিচ্ছে। বাবা ও মার মতলবখানা সে বুঝতে পারে না। মনের সাথে অনেক সংগ্রাম সে করেছে তবুও কোন একটা নিশ্চয়তার মধ্যে আসতে পারেনি। অখিলকে কেন্দ্র করে সুধাংশু ও সুরূপার মধ্যে যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে মতের, তাতেও লীনা কিছুই ঠাহর করতে পারে না। এক এক সময় সে হাঁপিয়ে ওঠে—দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবেগ চলতে থাকে। মনে হয়, কোথাও গিয়ে কিছুকাল ঘুরে আসা দরকার। আবার পরমুহূর্তে তার মনের রূপ পাল্টে যায়। একা এ জীবনের আনন্দ উপভোগ করা চলে না। নানা দ্বন্দ্বের মাঝখান দিয়ে ঝড়ের মুখে পড়া পাখীর মত মুখ গুঁজে সে কাঁদতে ইচ্ছা করে বুকফাটা আর্তনাদে।

সন্তর্পণে পা টিপে টিপে অখিল এসে ঘরে ঢুকল। মেঘের কোলে লুকিয়ে থাকা একখণ্ড চাঁদের আলোর সহসা আত্মপ্রকাশে সারা ঘরখানা আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠে।

—অখিলদা তুমি এসেছ ?

একখানা চেয়ারের উপর অখিল বসে জিজ্ঞাসা করে, এত কি চিন্তা তোমায় ঘিরে ধরেছে লীনা ?

অখিলের এমন কথায় লীনা শঙ্কিতা হয়। সে ভাবে হয়ত সব কথা অখিল জানতে পেরেছে। হয়ত বা তাদের বাড়ীতে আজই অখিলের শেষ পদ সঞ্চার। শঙ্কার ভাব কাটিয়ে লীনা জিজ্ঞাসা করে, তুমি যা শুনেছ—সে কিছু নয়।

কয়েকদিন আগেই অখিলের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। দুর্বলতা তখনও ঘোচেনি। অখিল উত্তর দিল, কি বলছ তুমি—বুঝতে পারছি না। আজ আর বেশীক্ষণ বসতে পারব না। ডাক্তারবাবু বলেছেন, বেশী রাত জাগা চলবে না। হঠাৎ লীনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। মনের কোণে যে খণ্ড মেঘের আবির্ভাব ঘটেছিল সেটা যেন জলভারে জমাট বাঁধে।

অপ্রত্যাশিতভাবে অখিলের একখানা হাত ধরে ফেলল লীনা, —আমায় ভুলে যাও—তোমার শরীর ভালো হোক।

—ও। মানে তোমার সাথে পরিচয়েই আমার শরীরে ব্যাধির উৎপত্তি। মিথ্যে কথা। অযথা কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা আর যে কেউ পারলে—আমি পারব না।

—সত্যি বলছি অখিলদা।—সত্যিই তুমি আমায় ভুলে যাও।

—কি বলছ' এ সব। হঠাৎ তোমার এ রূপান্তরে আমি বিস্ময় বোধ করছি। লীনার প্রতিটি কথার ভেতর অখিল যেন কোনও নূতন তথ্য আবিষ্কার করবার চেষ্টা করে। শাড়ীর খুঁট দিয়ে লীনা তার চোখ দুটো ঢেকে ফেলে।

—মনে কোরো আচমকা দেখা হয়েছিল—আবার চলে গেছে। মনে কোরো বিজলীর আলো জ্বলেছিল—আবার নিভে গেছে। পথঘাট আগের মতই ডুবে রয়েছে অন্ধকারে। কান্নার রোল ছাপিয়ে উঠতে থাকে লীনার। তার একখানা হাত চেপে ধরল অখিল।

—আজ এসেছিলাম, তোমাকে কয়েকটা কথা বলবাব জন্য। কিন্তু আমার সে আশা উৎসাহ সমস্ত দমে গেল। তুমি কি আমার কোন কথাই রাখতে পারো না আবেগের সাথে অখিল প্রশ্ন করল।

বাঁধ ভাঙ্গা নদীর মত লীনা এবার ফুঁসে ওঠে; —না—না—না। যদি তোমার সে ক্ষমতা থাকত, তা হলে অন্যের সাথে জড়িয়ে দেবার জন্য এত আয়োজন চলত না। তুমি জানো ভালবাসতে, নিবিড়ভাবে পাবার কৌশল জানো না।

অখিল হতাশার সাথে উত্তর দিল, হ্যাঁ সত্যিই আমি অক্ষম। প্রার্থনা করি, আমাব এ ভালবাসার ভেতব যদি খঁত না থাকে, তবে তোমার মিলনের পরিপূর্ণতার মাঝে তার সার্থকতা দেখবাব যেন সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি।

লীনা চুপ কবল। বেদনাবিধব আবহাওয়ায় ঘবেব ভেতবটা থমথম করতে থাকে।

বাইরের বিরাট বিশ্বে যে আলোড়ন সুরু হয়েছে—সেই আলোড়নেব মাঝে এরা নিজেদেব কোন গাডেব দিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, বুঝতে পাবে না।

সমস্ত ঘরের আবহাওয়া একটা ক্ষুব্ধ বেদনায় হাহাকাব করে ওঠে। লীনা যখন বলল, আমায় ভুলে যাওয়া তোমার কাছে কঠিন কোন সন্দেহ নেই—তবুও আমার এ অনুরোধ। তোমায় বাখতেই হবে অখিলদা।

বিষণ্ণ চিত্তে উত্তর দেয় অখিল, জানতাম আমার তপ্ত অশ্রুধারা নেমে আসবে হয়তবা কোনদিন তোমার ঠিক এমনিধারা অনুরোধে।

লীনা ফুলের তোড়া থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে নিঁয়ে তাকিয়ে থাকে। পরে ধীরে ধীরে আত্মসম্বরণ করে এগিয়ে আসে অখিলের দিকে। তার অন্তর মথিত করে বেদনার বাণ ডাকে;—অতীতের বারিধারা মত শুধু ভিজিয়ে রেখ আমাদের এই চলার পথের স্মৃতি।

—হ্যাঁ লীনা, আমিই ভুল করেছি। তবে তোমায় জীবনসঙ্গিনী-রূপে পেতে চাইনি—ভালবাসতে চেয়েছিলাম—তাই যখন শুনতে পেলাম তোমার মিলনের আয়োজন চলেছে, মোটেই দুঃখিত হই নি; অপার আনন্দলাভ করেছি। দেহ ও মন দুটি পৃথক সত্তা। দেহ ভোগে আনন্দ লাভ করা যায় ক্ষণিকের জন্য। কিন্তু মনের মিলনে স্থায়ী সুখ মিলে থাকে; উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে দ্রুত পায়ে অখিল বের হয়ে গেল।

লীনা কোন প্রতিবাদ করল না।

সুধাংশু সেন ও সুরূপা ফিরে এলেন। বাইরের খোলা বাতাসে তারা যে ক্লান্তি অপনোদন করে এসেছিলেন; ঘরে ঢুকতেই তা উবে গেল।

কোনদিকে না চেয়েই সুধাংশু হাঁক ছাড়লেন, মাষ্টার ও মাষ্টার। কোনরূপ প্রত্যুত্তর না পেয়ে তিনি মেয়ের দিকে চাইলেন; মাষ্টার আজ আসে নি?

লীনা চুপ ক'রেছিল টেবিলের উপর মুখ গুঁজে।

সুরূপা বল্‌লেন, ও ঘুমুচ্ছে বোধ হয়।

লীনা মুখ তুলল; না মা, শরীর ভাল নেই—মাষ্টার মশাইকে চলে যেতে বলেছি। কথা কয়টি বলেই ও ওখান থেকে চলে গেল। সুধাংশুবাবু বিস্ময় বোধ করলেন। স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, চলে গেল যে?

সুরূপা হাতের ভ্যানিটী ব্যাগটাকে যথাস্থানে রেখে উত্তর দিলেন, কি জানি?

গায়ের জামা খুলে সুধাংশু বল্‌লেন, নিশ্চয়ই অখিল এসে কানে কিছু মন্তর দিয়ে গেছে।

বিরক্তির সুরে তিনি আবার বল্‌লেন, তোমরা বলো অখিল ভাল ছেলে। আমার কাছে কিন্তু ভালো লাগে না।

তিনি অন্য ঘরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই লীনা আবার ফিরে এল? মেয়ের দিকে সতর্ক দৃটি রেখে সুরূপা প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে তোর? এলি আবার চলে গেলি—কেন?

—আমি অন্যস্থানে বেড়াতে যেতে চাই অন্তত কিছুকালের জন্য; লীনা ঝুপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

সুধাংশু তাঁর গতি পরিবর্ত্তন করলেন,—হঠাৎ—

—শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

—তা বেশ, ক'দিন চেঞ্জে গেলেই ওসব সেড়ে যাবে।

লীনা উত্তর দিল, রোগ জটিল হবার আগেই পাঠিয়ে দাও।

সুরূপার চিন্তা বেড়ে যায়, মা হয়ে মেয়ের অসুখ জানেন না—এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব। তবুও জিজ্ঞাসা করলেন, অমতের আর কি থাকতে পারে—কিন্তু একা চলাফেরার বয়স তোমার আর নেই।

চেয়ারে বসে সিগারেটের প্যাকেট থেকে সুধাংশু একটা সিগারেট বের করলেন। দিয়াশলাইয়ের বাক্সের উপর সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে তিনি বল্‌লেন, আর তা ছাড়া যাবে কোথায়?

সুরূপা বল্‌লেন, উনি ত' যেতে পারবেন না। এখন যা কাজের ভিড়।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে সুধাংশু বল্‌লেন, তাই ভাবছি, যাতে একা তোমাকে চেঞ্জে যেতে না হয় তার একটা ব্যবস্থা করে সামনের মাসেই না হয়…।

ব্যথায় টন্‌টন্ করে লীনার বুকের ভেতর। অগ্রগামী যৌবনের দূত অনেক আগেই তার দেহ মনে কিসের যেন সাড়া এনে দিয়েছে। অনেক সময় মায়ের দৃষ্টিতে তা ধরা পড়লেও বাবার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। লীনার বেলাতেও ঠিক এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটল না।

লীনা ব্যাকুলভাবে উত্তর দিল, মানুষের কোলাহল থেকে কালই আমাকে পাঠিয়ে দাও এই ঘিঞ্জি শহর থেকে।

মেয়ের এরূপ ভাবান্তরকে হৃষ্টমনে গ্রহণ করতে পারলেন না তার মা ও বাবা।

স্বরূপা প্রশ্ন করলেন, এ হতাশা আর দুঃখের এমন কি কারণ ঘটেছে বলতে পারো ?

লীনা মুখখানা আনত করে উত্তর দিল, দুঃখ কিসের ? সুখ আমি আর চাই না—দুঃখের মাঝেই সুখের সন্ধান পেতে চাই।

তড়িৎগতিতে লীনা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দমকা হাওয়ায় সারা ঘরখানা হুড়মুড় করে উঠল।

অনেক চিন্তা ভাবনার পর সুধাংশু স্থির করলেন তাঁর বন্ধু অতুলের সাথে পরামর্শ করে মেয়ের সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থা করবেন। স্ত্রী স্বামীর কথায় সম্মতি জানালেন। ওই একটি মাত্র ওষুধেই বুঝি বয়সের ব্যাধি নিরাময় করা যেতে পারে শতকরা নিরানব্বই জন তাই ভেবে থাকেন।

সাত

কয়েকদিন হোল অখিল রোগশয্যায়। রোগ মারাত্মক না হলেও চিকিৎসক তাকে যথেষ্ট সাবধানে থাকবার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। অসুস্থ অবস্থায় অখিল একটি বিছানার উপর শুয়ে ছিল। তার বিছানার একপাশে মাথার সামনে টেবিলের উপর বাটি দিয়ে এক গেলাস জল ঢাকা রয়েছে। সে একবার হাত বাড়িয়ে গেলাস থেকে জল পান করে উপরের দিকে থাকল একটু তাকিয়ে। তারপর আপন মনে গুন্‌গুন্ ক'রে কি যেন গানের কলি ভাঁজতে লাগল।

অখিলের মা ঊষা পাশের ঘরেই বিশ্রাম করছিলেন। ছেলের সাড়া পেয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন।

—কেমন আছিস ?

অখিল আবার একটু জল পান করে উত্তর দিল, ভালোই—তবে জানো মা……।

উষা ব্যগ্র দৃষ্টিতে অখিলের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, কি বাবা ?

অখিল মাথার বালিশ সরিয়ে দিয়ে ঘাড় উঁচু করে হাসতে থাকে।

—হাসছিস যে ? উষা প্রশ্ন করলেন।

—আচ্ছা মা, আমায় ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে ত ?

উষা ভয় পেলেন। এ সব কথা কি তোর ?

—ভয় পেও না মা। বলছিলাম, ধরো যদি আমি আজ বিদেশ চলে যাই··

উষা ছেলের মাথার শিয়রে বসে তার মাথার চুলের ভেতর হাত বুলোতে লাগলেন পরের কথাগুলো শোনবার জন্য।

অখিল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে অবোধ শিশুর মত।

উষা বললেন, কি ভাবছিস তুই ? চুপ করে থাক্। বেশী চিন্তা করলে শরীর যে আরও খারাপ হয়ে যাবে।

অখিল মাথার উপর থেকে তার মায়ের হাতখানা সরিয়ে নিল। বলল, শরীর যা খারাপ হবার হয়েছে—এর চে' আর খারাপ হবে না।

উষা আবেগের সাথে স্নেহভরে বল্লেন, না খারাপ আর হবে না—তোর পরীক্ষা দিতে হবে না ?

অখিল ফিরে শুয়ে উত্তর দিল, হুঁ।

—হুঁ করলি যে ?

—এমনি। একটু চুপ করে অখিল উত্তর দিল, জীবনটাই তো পরীক্ষা নিয়ে গড়ে উঠেছে।

অখিলের কথাগুলোর ভেতর অন্য কিছুই খুঁজে পান না উষা। তিনি যেমন মানুষ তেমনি ধারা কথা বল্লেন, কেন পরীক্ষা

না দেবার এমন কি কারণ ঘটল, যদি তোর বাবা শুনতে পান, কি বলবেন শুনি ?

—বাবার কথা বল্‌ছ,—অখিলের কথা শেষ হবার আগেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন অক্ষয়।

উষার দিকে তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, কেমন আছে ও ?

—ও তো ভালই বলে। আমার মনে হয় দিন কয়েকের জন্য ওকে কোথাও পাঠিয়ে দাও। বাইরের হাওয়া লাগলে শরীরটা শুধরে যেত ; উষা স্বামীর দিকে সম্মতিলাভের জন্য তাকালেন।

ছেলের শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে অক্ষয় চিন্তিত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। ছেলের প্রতি বাবার কর্তব্য জেনেও তিনি চট্ করে স্ত্রীর কথার জবাব দিতে পারলেন না। ভেবেছিলেন পাটনার সেই ভদ্রলোকের মেয়ের সাথে অখিলের বিয়ে চুকিয়ে ফেলেন। তা হোল না। ছেলে বেঁকে বসল। এক এক সময় অক্ষয় নিজেই বিস্মিত হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন অর্থশূন্য ভাবে পুরোনো মাটির উপর নূতন পলিমাটি পড়ে সৃষ্টি করছে নূতন পৃথিবী। প্রকৃতি দেবীও কেমনধারা বিগড়ে গেছেন। ঋতু পরিবর্তনেও বিভ্রাট—কালের হাওয়া কেমন যেন বেসুরো। কারও সাথে কারও যোগাযোগ নেই।

অক্ষয় উত্তর দিলেন, উহুঁ। এখন তোমার কথায় সায় দিতে পারছিনা—টাকাকড়ির একান্ত অভাব। তোমাদের আর কি—বলেই খালাস, এদিকে টাকা আয় করতে আমাদের রক্ত জল হয়ে যায়।

মৃদুস্বরে অখিল কি যেন বল্‌ল। অক্ষয় কাণ পেতে কথাগুলো শুনবার চেষ্টা করলেন।

প্রচণ্ড কাশির বেগে অখিল হাঁপিয়ে উঠতে থাকে। একটু দম নিয়ে সে বলে, হয়ত চাইলে পেতাম। কিন্তু চাইব না। তার সাহায্য নিয়ে বাঁচবার সার্থকতা নেই।

অখিলের কথা বলার মাঝখানে একটি চিঠি হাতে তাদের বাড়ীর চাকর ঘরে ঢুকল।

ঊষা হাত বাড়িয়ে চাকরের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে নিলেন, কে দিলে?

চাকরটি উত্তর দিল, আঁজ্ঞে তা বলতে পারি না। একজন লোক এসে বলল, দাদাবাবুকে চিঠিখানি দিয়ে দিতে খুব জরুরী।

ঊষা বললেন, যা দেখে আয় বাইরে লোকটি আছে নাকি?

ঊষার ইঙ্গিতে চাকর বাইরে চলে গেল।

চিঠিখানার প্রথম কয়েক লাইন দেখে নিয়ে ঊষা বললেন, এ যে তোর চিঠি।

বিস্ময়ের সাথে অখিল উত্তর দিল, আমার?

—হ্যাঁ।

—দাও।

মায়ের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে অখিল খুব মনোযোগের সাথে দেখতে থাকে।

চাকরটি ফিরে এসে জানিয়ে গেল যে কোন লোকই বাইরে দাঁড়িয়ে নেই, চলে গেছে।

ঊষা ধীরে ধীরে ছেলের মাথার শিয়র থেকে উঠে দাঁড়ালেন, কে লিখেছে রে?

অখিল হাসে। হাসিতে রস নাই—আনন্দ নাই, আছে শুধু ব্যথার আর্ত্তনাদ।

মা আবার প্রশ্ন করতেই অখিল বলল, আমার এক বন্ধু।

ঊষা প্রশ্ন কর্লেন, কি লিখেছে?

চিঠিখানি খামের মধ্যে পুরে অখিল উত্তর দিল, কিসের যেন উৎসব রয়েছে—আমার নিমন্ত্রণ।

একটা কাগজের উপর উত্তর লিখতে লিখতে সে বলল, তুমিও যেমন ভেবেছ আমি যাবো। অখিল থামল। ঘস্ ঘস্ করে কয়েক

লাইন লিখে চলল সে ; শোনো লিখে দিলাম—যেতে পারব না, শরীর অসুস্থ। তবে, তোমার সাদর আহ্বানে বিশেষ প্রীত।

উষার ডাকে চাকর এসে আবার ঘরে ঢুকল। অখিল তার হাতে চিঠিখানা দিয়ে বলে দিল—পৌঁছে দিয়ে আয়।

চাকর প্রশ্ন করে, কোথায় ?

অখিল ঠিকানা ব্যাংলে দেয় ; মোড়ের পাশে ওই যে আম বাগান তার বাঁ হাতে যে লাল রাস্তা—সেই রাস্তার উপরে যে বড় বাড়ীটা বুঝলি।

চাকর মাথা নেড়ে সব বুঝে নিয়ে চলে গেল।

উষা কখন যে সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন তা অখিল টেরই পায়নি।

আপন মনেই সে বলে ওঠে, ধন্য মানুষ এরা।

অক্ষয় গড়গড়া আনবার জন্য চাকরকে ডাকছিলেন। কোন সাড়া না পেয়ে তাকিয়ে দেখলেন, চাকর একটা চিঠি হাতে বেরিয়ে যাচ্ছে। ভেতরে গিয়ে তিনি অখিলকে প্রশ্ন করলেন, চাকরটাকে আবার চিঠি হাতে পাঠালি কোথায় ?

—আমার এক বন্ধুর বাসায়।

এমন অসময়ে বন্ধুর বাড়াতে চিঠি দিয়ে পাঠাবার কি কারণ আছে—আমাকে এখন তামাক সেজে দেয় কে বল্ ?

অখিল উঠবার চেষ্টা করল।

অক্ষয় হাত বাড়িয়ে তাকে বাধা দিয়ে বললেন, না না থাক—আমিই পারব।

এমন সময় উষা গড়গড়া সাজিয়ে নিয়ে উপস্থিত হলেন।

ক্রমাগত গড়গড়া টানবার পর অক্ষয় তাকালেন ছেলের দিকে জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে।

—আচ্ছা অখিল চিরকাল কি আমরা শুধু খেটেই মরব ?

—কেন ?

—কেন আবার? তোর মায়ের দিকে কখনও চেয়ে দেখেছিস, পাঁজড়ার হাড় কখানাই সার হয়েছে।

ঊষা একপাশে চুপ করে দাঁড়ালেন।

অখিল উত্তর দিল, তা আমি কি করব?

একটু চিন্তা করে অখিল আবার বলে, একটা বামনী রাখলে হয় না?

ঊষা কথার মাঝখানে বাধা দিলেন, আবার বামনী দিয়ে কি হবে?

অক্ষয় উদাস সুরে উত্তর দিলেন, তা যদি বুঝতে—!

মায়ের শরীর ক্রমাগত ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে, অখিল জানত। কিন্তু তার কোন প্রতিকার করবার উপায় ছিল না। শঙ্কিত দৃষ্টিতে সে মায়ের দিকে তাকিয়ে শুধাল, হ্যা মা, সত্যিই তুমি দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছ?

শুকনো হাসিতে ঊষা উত্তর দেন, কে বল্‌লে—পাগল ছেলে আর কি!

মেঝেয় পা ঘসতে ঘসতে অখিল বলে, তবে যে বাবা বল্‌লেন।

ঊষা বুঝতে পেরেছেন অখিলের মনে এখন যে ভাবের সৃষ্টি হয়েছে তাতে বিন্দুমাত্র ফাঁকিজুঁকি নেই। সেজন্যে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেও পশ্চাদ্‌পদ্ হলেন না তিনি। আরো এগিয়ে এলেন ছেলের কাছে।

খুব আস্তে বল্‌লেন—আমার মাঝে মাঝে ভারী ইচ্ছা করে লক্ষ্মীর মত একটি মেয়ে নিয়ে এসে ঘরে লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করি। তা হলেই আমার সব দুঃখ ঘুচবে। আমার কি সাধ আহ্লাদ নেই?

অখিল বিষম বিপাকে পড়ল। একদিকে মায়ের সুস্পষ্ট স্বাস্থ্যহানি অপরদিকে নিজের ইচ্ছাপূরণ এই দোটানার মধ্যে খেই হারিয়ে ফেলে সে।

—কিন্তু জানো ত' মা, বিয়ে আমি করব না। আর যদিই বা করি—একটু থেমে অখিল উত্তর দিয়ে বাইরের খোলা জানালা দিয়ে তাকায়। কি বিরাট এই পৃথিবী—কত কাজ করবার আছে

মানুষের। শুধুমাত্র একজন সঙ্গিনি এনে ঘর আলো করাই বড় কথা নয়। তার চেয়েও অনেক কাজ রয়েছে যাকে জীবনের সাথী করে নেয়া প্রয়োজন।

বাইরের আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ এখানে সেখানে ছুটোছুটি করছে। কোথাও জমাট বেঁধে ওঠেনি এখনও। কয়েকটা রাজহাঁস রাস্তার ওপিঠে একটা পুকুর পাড়ে ডানা মেলে রোদ পোহাচ্ছে। শুভ্র সুন্দর এই রাজহাঁসগুলোর দিকে তাকিয়ে অখিল ভাবে মানুষের জীবন কি এমন ধারা শুভ্র সুন্দর হয়ে উঠতে পারে না। একটু বাদেই রাজহাঁসগুলো নেমে গেল পুকুরের ভেতর জলকেলার জন্য। ওরা বুঝি নিজেদের জুড়ির নিয়েই খেলা সুরু করেছে। জানালার আরো কাছে এসে অখিল গালে হাত দিয়ে রইল প্রাণীগুলোর দিকে চেয়ে।

উষা এবার জিদ্ ধরেন, বিয়ে তোমার করতেই হবে কিন্তু টিন্তু বুঝি না।

আচমকা সেখানে লীনা এসে উপস্থিত হোল। লীনার উপস্থিতিতে উষা অনেকখানি যেন ভরসা পেলেন, এস লীনা। আচ্ছা তুমিই বলবে'খন। লীনা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করে, কি বলতে হবে বলুন ?

উষা ইতঃস্তত করে পরে বল্লেন, বলছিলাম অখিলের বিয়ের কথা। ও বলছে বিয়ে করবে না। আমার শরীরের অবস্থা তো দেখ্ছ—একেবারে পোড়াকাঠ হয়ে গেছি।

অখিলের দিকে তাকিয়ে লীনা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

উষা আবার প্রশ্ন করলেন কি চুপ করে রইলে যে? বিয়ে করা কি উচিত নয়?

লীনা আনত মুখে উত্তর দিল, হ্যাঁ।

অখিল বক্র দৃষ্টিতে তাকাল লীনার দিকে, খুব তাল দিতে শিখেছ দেখছি। বিয়েটা আজকাল মুখ্য নয়, ওটা গৌণ।

উষার দিকে তাকিয়ে লীনা বল্‌ল, তবে অখিলদার এখন যা শরীরের হাল তাতে বিয়ে আপততঃ স্থগিত রাখাই ভাল নয় কি মাসীমা ? কিছুকালের জন্য অখিলদাকে চেঞ্জে পাঠিয়ে দেন না— শরীর শুধরে আসবে'খন।

উষা অবশ্য লীনার প্রস্তাবে কোন আপত্তি কর্‌লেন না। তবু একবার প্রশ্ন করলেন, আমাদের সংসারের অবস্থা কি তুমি জানো না মা ?

কিছুক্ষণের জন্য কারো মুখে কোন কথা সরল না। কঠিন এক সমস্যা দেখা দিয়েছে এ কয়জন প্রাণীর প্রাণে। অনেক ভবিষ্যৎ হয়ত লুকিয়ে রয়েছে এই সমস্যার সমাধানে। আর সে সমস্যার সমাধান করতে যেয়ে আরো জোট পাকিয়ে যাচ্ছে।

লীনা একবার চোখ বুঁজে। বুকের অতলে কা যেন সে খুঁজে বেড়ায়। আর চিন্তা করতে পারে না সে। তার বুকের ভেতর থেকে কি যেন ঠেলে উঠছে। বাইরের খোলা হাওয়া ঘরের মধ্যে ঝড়ের বেগে যদি এখনি এসে ঢোকে তো সে বেঁচে যায়। ধীরে ধীরে অনুনয়ের সুরে লীনা জবাব দিল, যদি কিছু মনে না করেন—।

—বলো।

—আমি······।

—তা হয় না, না।

—কেন মাসীমা। অখিলদার শরীর শুধরে গেলে আমার সকল শ্রম সার্থক হবে। পয়সা মানুষ উপার্জ্জন করতে পারে—কিন্তু কল্যাণের পথেই যদি তার ব্যয় না হয় তবে সে পয়সার কি মূল্য বলতে পারেন ? বুকের ভেতরকার জ্বলন্ত আগুণে একমুঠো ধূলো লীনা ছুঁড়ে দিল। দপ্ করে উষ্ণ হল্কা বার হয়ে এল।

উষা বিব্রত বোধ করলেন। অনেক ভাবলেন তিনি। কিন্তু লীনার অনুরোধ তিনি অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। বল্‌লেন, ঠিক

আছে মা। চেঞ্জ থেকে ফিরে এসেই ওকে বিয়ে করতে হবে—তুমি মত করিয়ে রেখ তোমার অখিলদার।

লীনা মৃদু হাসল, আচ্ছা।

ও ভাবল এ আর এমন কি কঠিন কাজ। এতকাল ধরে যাকে সে দেখে এসেছে তাকে স্বমতে আনতে হয়ত দুচারটে কথা বললেই সুরাহা হয়ে যাবে এসব সমস্যার। কিন্তু লীনা বুঝতে ভুল করল। অখিলের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাব সে কোনদিনই জানেনি। নিজের আদর্শ রূপায়নের জন্য সে সব ত্যাগ করতে পারে।

অক্ষয় ও ঊষা কিছু বলতে বলতে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

তাঁরা চলে যাবার পর অখিল লীনার দিকে চেয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, একি করলে—তুমি কি আমায় শুধু ···।

লীনা দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিল, হ্যাঁ তোমায় বিয়ে করতে হবে। আমার বিয়ের কথা চল্‌ছে অন্যখানে। জীবন মধুময় করে তোলবার জন্য তোমার দেরী করা কি ঠিক হবে অখিলদা? মুখখানা নীচু করে লীনা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল।

সারা আকাশ জুড়ে আজ যেন মেঘের আনাগোনা আর গুরু গুরু গর্জ্জন ধ্বনি। শ্রাবণের বারিধারা নয়, এ যেন কালবৈশাখীর পূর্ব্বাভাষ।

অখিল প্রশান্ত-সমাহিত-ধ্যানমগ্ন-স্তব্ধ।

সহসা ধ্যানমগ্ন অখিলের কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হয়, লীনা, হয়ত তোমাদের সমাজের কাছে আমার বড় পরিচয় নেই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে আজ আমার বড় সাধ লাগছে ভালবাসার তুলাদণ্ড কি শুধু ধন দৌলতে? যুগযুগান্তরের ইতিহাস তবে কি মিথ্যা?

লীনা বিমর্ষভাবে উত্তর দিল, সব জানি। আধুনিক সমাজের দীপশিখায় আলোকিত হয়ে উঠলেও অতীতের ধারাকে মুছে দিতে পারি নি,—তার জন্য আমায় ক্ষমা করবেন। আমার অনুরোধ ঠেলে দেবেন না।

অখিল হতবাক হয়ে যায়। কি উত্তর দেবে খুঁজে পায় না। একসূত্রে গাঁথা যে মালা রচিত হয়েছিল—আজ তা অকস্মাৎ কেন খসে পড়ল সে বুঝতে পারে না। তার চোখ দুটো ভার হয়ে আসে। অন্তঃসলিলা তার বুকের মাঝে বয়ে চলেছে। বাইরে দেখে কিছুই বোঝবার উপায় নেই। এক এক সময় তার মনে হয় সমগ্র পৃথিবী ভীষণ এক আলোড়নে ভেঙে চুরমার হয়ে যাক্—ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাক যত নিষেধের ডোর—উড়ে যাক কুটিল কুশ্রী বেড়াজাল। সোজা হয়ে দাঁড়াল অখিল। সমস্ত শরীর একসাথে টেনে সে সোজা করল। তার ক্ষীণ বাহু দুটোতে সঞ্চারিত হল অপরিমেয় শক্তি। লীনার কথায় তীব্র প্রতিবাদ করে সে, তোমার সব কথা রাখতে পারি; কিন্তু এ অনুরোধ রাখতে পারব না। অখিলের সারা শরীর জ্বলতে থাকে। একটু থেমে সে আবার বলে, মনে রেখো—তোমার মিলন মাঙ্গলিকে আমি অমঙ্গলের দূত সেজে রইব না। আমি···

ঝাপসা চোখে লীনা বারবার পলক ফেলতে থাকে। ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে। সমস্ত কথাই বাধা পায় দুটো ঠোঁঠের ফাঁকে।

নিজের দুর্ব্বলতাকে অনেক কষ্টে সে সামলে নিল। তবু তার কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হয় শরবিদ্ধ পাখীর পাখা ঝাপটানি। উত্তর দিল সে, তোমায় সুখী করতে পারব না বলেই বুকভরা ব্যথা নিয়ে নিজেই তোমাকে এই অনুরোধ করতে এসেছি। হয়ত আমার রূপে তুমি মুগ্ধ হয়েছিলে—কিন্তু রূপসী কি আর নেই?

ক্ষোভে ও ঘৃণায় অখিলের চোখ রক্তিম হয়ে ওঠে। শ্লেষের সাথে সে বলল, আমার সামনে দাঁড়িয়ে একথা বলতে লজ্জা করছে না তোমার? এক মুহূর্তে লীনার সব কিছু ওলটপালট হয়ে যায়। আত্মসংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তার হাত দুটো প্রসারিত হয়ে নেমে আসে অখিলের পদপ্রান্তে। ক্ষিপ্রগতিতে তার হাত দুটো অখিল ধরে ফেলল, ছিঃ! এ অদ্ভুত মনোভাব কেন?

লীনা চোখ ঢেকে ফেলল।

—আমায় ক্ষমা করতে পারো না?

অখিল জানালার সামনে এসে দাঁড়াল।

পশ্চিমের আকাশে অস্তরবির গোধূলি আলোক ছড়িয়ে পড়েছে। এক ঝাঁক পাখী উড়ে যাচ্ছে। তন্ময় হয়ে অখিল চেয়ে থাকে সুদূর আকাশের দিকে।

লীনা চোখ মুছে ডাকে; অখিলদা—

অখিল ফিবে দাঁড়ায়। সে বলে, আজ বিচাবের দিন নয় লীনা—বিদায়ের দিন। রূপকে ভালবাসিনি—ভালোবেসেছিলাম তোমার সব কিছুকে তাই এই বিদায়ের মাঝেও দেখছি তাব বিজয় পতাকা উড়ছে।

শান্তভাবে লীনা জবাব দিল, জানি অখিলদা।

ক্লান্ত হয়ে অখিল একটা চেয়াবে বসে পড়ে। এই অল্প সময়ের মধ্যে তার জীবনের উপর দিয়ে যেন প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। তার প্রতিটি চিহ্ন তার চোখেমুখে রেখায়িত।

গম্ভীরমুখে অখিল বলে, একটি কথা তোমায় স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই। তোমার বাবার অগাধ সম্পত্তির মোহে তাঁর কন্যার পাণিপ্রার্থী হবার মত দুর্ব্বলতা আমার ছিল না। নারীসঙ্গ লোলুপ আমি নই, রূপ বা ঐশ্বর্য কোনটাতেই ভালোবাসার মূল্য নেই। সেখানে আছে মোহ। আমি চেয়েছিলাম তোমার ভালবাসাব শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করতে। ভালোবাসা একটি আদর্শ। তাই রক্ত মাংসের তোমার শরীরকে ভুলতে আমার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় নি।

লীনা ছটফট করতে থাকে। অখিলের কথাগুলো বিষমাখা তীরের মত তার বুকের ভেতর বিঁধে বসে যায়। ঝর ঝর করে লীনার চোখ দিয়ে জল ঝরে। কি যেন তাকে অস্থির করে তুলেছে।

মুখখানা ঢেকে নিয়ে সে উত্তর দিল, আর বলোনা অখিলদা; যথেষ্ট হয়েছে। তুমি যা খুশি বলো—আমি তোমায় ভুলতে পারি না। লীনা চুপ করে। অখিল নিরুত্তর থাকে।

ভালোবাসা স্বাভাবিক ধর্ম। বিধি নিষেধের বেড়াজালে সমাজ দেয় তাকে বাধা। সেই বাধায় নিরন্তর নিপীড়িত হয়েছে শুধু নারী। সমাজের প্রতিটি স্তরে। লীনার চিন্তাধারা মোড় ঘোরে। সে বলে ওঠে, আমাদের কতটুকু ক্ষমতা তোমরা দিয়েছ। চিরকাল নারীর উপর আধিপত্য করেছ, তাদের পলে পলে পায়ে দলে পিষে মেরেছ। তাদের স্বাধীনভাবে কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে দাওনি, অন্দর-মহলে শুধু গঞ্জনা শোনার অধিকারই দয়া করে দিয়েছ তোমরা—পারো তা অস্বীকার করতে ?

গম্ভীরস্বরে অখিল এ কথার উত্তর দেবার আগে লীনার বাঁ হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল, এসব বলবার তোমার অধিকার আছে আমি জানি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি লেখাপড়া শিখেও তোমরা কেন বিপদে পড়লে মিইয়ে যাও, মাথা তুলে শক্তির দৃপ্ততায় হাসতে পারো না ? দোর বন্ধ করে শুধু কি আচলই ভেজাবে ?

ঝঙ্কার দিয়ে উঠল লীনা। দ্রুতগতিতে সে অনেক কথা বলে ফেলল, তুমি এত হৃদয়হীন। একবারও কি তলিয়ে দেখবে না আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে, আমি কোথায় বসে আছি। তোমার প্রাণ যা চায় তাই শুনিয়ে চলেছ তুমি ? যতবারই তোমরা কল্যাণভরা বাহু বাড়িয়ে আস ততবারই কি তোমরা ভাবনা যে আমাদের অনুগ্রহ করছ তোমরা, তাই তোমাদের মুখে কথা ফোটে আর— আমরা শুনি।

লীনা চলে যাবার জন্য ফিরে দাঁড়ায় এবং পরক্ষণেই ঝড়ের বেগে বের হয়ে যায়।

—দাঁড়াও, গুরুগম্ভীরস্বরে অখিল বলে ওঠে ; একা শুধু আজকেই তোমায় পাইনি—পেয়েছি অনেকদিন আগে। কিন্তু বলার প্রয়োজন হয়নি। আজ বলার প্রয়োজন হয়েছে।

অখিল হতভম্ব হয়ে পড়ে। লীনার মূর্তি দৃষ্টি বহির্ভূত হওয়ামাত্রই চকিত হয়ে ওঠে সে। ছুটে যায় জানালার ধারে। দ্রুতগতিতে

লীনা বেরিয়ে যায়। অখিল ডাক দেয়, লীনা। লীনার কানে সে ডাক পৌঁছায় না।

আট

স্বরূপা একটি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরম যত্নে তার মাথার চুলগুলো আচড়ে নিচ্ছিলেন। লীনাব প্রাইভেট টিউটর অসিত গালে হাত দিয়ে ড্যাব ড্যাব চোখে সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে।

সুধাংশু ভাবছিলেন, গভীর ভাবেই। তাঁর চিন্তাধারা যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। স্ত্রীর ব্যক্তিত্বকে স্বীকাব তিনি কবে নিয়েছেন, তাঁর মতামত ছাড়া কিছুই তিনি করেন না বলতে গেলে। স্বরূপাও তাঁব কোন কাজে তেমন বাধা দেননি কোনদিন। মেয়ে সম্পর্কে স্বামী ও স্ত্রীব মতভেদ থাকলেও স্বরূপাব সঠিক কোন সিদ্ধান্ত নেই। তবে ভালো লাগে অখিলকে।

সুধাংশু ভাবতে ভাবতে কেমন যেন নিস্তেজকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন অসিতের দিকে তাকিয়ে—হ্যাঁ তারপব কি বললে ও? পড়তে নারাজ—না?

—আজ্ঞে। কিন্তু··

—ঠিক বলেছ মাষ্টার। আমার কি মনে হয় জানো—কথা শেষ না করে স্ত্রীর দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে সুধাংশু বললেন—ওই অখিলটাই যত নষ্টের গোড়া।

জড়িতকণ্ঠে অসিত ইন্ধন জোগাল; সত্যি বল্‌তে কি, অখিল-বাবুকে দেখলেই আমার যেন কেমন ভয় হয়। কথা যা বলেন একেবারে—

স্বরূপা ফিরে তাকালেন অসিতের পানে। অসিত তাকিয়েই ছিল। চমকে গেল সে। এ কেমন চোখ রে বাবা। সুধাংশু ঘরের ভেতর পায়চারি করতে করতে হঠাৎ থেমে গেলেন। আবার এগিয়ে

গিয়ে আলমারির একটি দেরাজ টেনে খুললেন। এবার তাকালেন স্ত্রীর দিকে। স্ত্রীর বেশভূষার পারিপাট্যের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র মনোযোগ নেই।

—অসিতের কথা শুনতে পেয়েছ ?

কপালের উপরটাতে পাউডার ছড়াতে ছড়াতে সুরূপা অত্যন্ত সহজকণ্ঠে জবাব দেন, না শোনবার কি আছে ?

উত্তেজনায় সুধাংশুর শরীর হঠাৎ কেঁপে ওঠে।—অসিত পড়াতে এসে বসতে না বসতেই লীনা তার কাছে আবার পড়বার অক্ষমতা জানিয়ে গিয়েছে। সুধাংশু এ ঘটনা সহ্য করবেন কেমন করে ? নিজে সরকারী উকিল। মেজাজটাও পাত্রোচিত। সুধাংশু তাঁর মুখের সিগারেটটাকে বেশ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বেশি দূর গেল না। জ্বলতে লাগল সিগারেট। উঠে চেপে নিভিয়ে দিতেও ইচ্ছা করল না। বললেন, শুনতে পেলেই হ'লো আর কি ?

হাতের ছোট রুমালখানি দিয়ে কপালের পাউডারগুলো মুছতে মুছতে সুরূপা উত্তর দিলেন, বলো, কি করতে হবে।

—কি করা প্রয়োজন সবই আমায় বলে দিতে হবে—মেয়ের আজকালকার রকম-সকম খেয়াল করেছ ?

মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিলেন সুরূপা, কেন—কি হয়েছে ?

—হবে আর কি, অসিতের দিকে মুখ ফিরিয়ে সুধাংশু বল্‌লেন, কি হে মাষ্টার ?

অসিত ঘাবড়ে যায়। অনেকদিন থেকে সে লীনার মাষ্টারী করছে। আধুনিক সমাজের আলোকপ্রাপ্তা লীনা তার পিতার কাছে কেমন ধারা বেড়ে উঠেছিল, তার পরিচয় পেয়েছে অসিত, মাঝে মাঝে পিতা ও কন্যার বাক্‌যুদ্ধের অন্তরালে।

নিজের হাত দুটো একজোট করে সে উত্তর দিল, আজ্ঞে আপনি ঠিক বলেছেন।

স্বরূপার মুখে মৃদু হাসির ঢেউ খেলতে থাকে। তাঁর মুখের হাসি দেখে সুধাংশু মনে মনে আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

—শোনো, আমি অনেক ভেবে দেখেছি। লীনার বিয়ের ব্যবস্থা আশু প্রয়োজন ; নৈলে···।

—হুঁ,—আনমনা উত্তর দেন স্বরূপা। স্ত্রীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন সুধাংশু।

—শুধু 'হুঁ'তে কাজ হবে না। তুমি জানো যে, লীনা পড়াশুনো একেবারে ছেড়ে দিয়েছে।

বিস্ময়ের সুরে স্ত্রী উত্তর দিলেন, কেন? আমি তো তাকে রিডিং রুমে দেখে এলাম।

—দেখে এলে রিডিং রুমে! ও রকম আমিও দেখে থাকি। শোনো, মেয়েরা যখন পড়াশুনা করতে চায় না—খালি মুখ গুমরে পড়ে থাকে আর একলা থাকতে চায় তখন তাদের মনের অবস্থা বুঝতে বেশী বেগ পেতে হয় না ; সুধাংশু কথা শেষ করেই তাকালেন স্ত্রীর দিকে। স্বরূপা পুনরায় আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। স্বামীর কথার কি উত্তর দেবেন, বুঝতে পারেন না। স্ত্রীর নীরবতাকে লক্ষ্য করে তিনি এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। তাঁর মনের ভেতর নানা চিন্তার এলোমেলো ভিড়। সুধাংশু আবার ফিরে দাঁড়ালেন। স্ত্রীকে কিছু বলার জন্য তাঁর ওষ্ঠাধার কেঁপে ওঠে ; তোমার কি ইচ্ছা বলো ত'?

স্বরূপা হাতের চুড়িগুলো আর একটু উপরের দিকে তুলে বললেন, ইচ্ছা, অনিচ্ছার কি বা আছে। যাতে লেখাপড়ার প্রতি মেয়ের আগ্রহ জন্মায় তার জন্য আরো চেষ্টা করা দরকার।

চাপা হাসিতে সুধাংশু উত্তর দেন, দেখো হাজার হলেও তোমাতে আমাতে অনেক প্রভেদ। বুদ্ধিতে তোমার গলদ আছে, মেয়েদের চারিত্রিক বিশ্লেষণ অনেক করেছি আদালতে আর বাইরেও। আমি বলছিলাম কি জানো লীনার বিয়ের পর্ব্বটা যত শিগগির মিটিয়ে ফেলা যায় ভালো।

সুরূপা চেয়েছিলেন, মেয়ে লেখাপড়া শিখুক—পাশ করে কলেজ থেকে বের হয়ে আসুক। তিনি সেইজন্য স্বামীর কথায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। বললেন, ও আগে পাশটা দিয়ে নিক।

একটা সিগারেট জ্বালিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে সুধাংশু বললেন, ঠিকই বলেছ। এক সাথে দুটো পাশ দেবে। কি হে মাষ্টার তুমি যে বোবা হয়ে রইলে তখন থেকে।

স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্ত্তার ধরণে অসিত একটু বিস্ময় বোধ করছিল। এতক্ষণ পরে সুধাংশুর কথায় যেন সে অনেকখানি আশ্বস্ত হোল।

অসিত রুমাল দিয়ে কপালের স্বেদবিন্দু মুছে উত্তর দিল, আজ্ঞে আপনার যুক্তি অকাট্য।

অসিতের কথা শুনে সুরূপা প্রশ্ন করলেন, কেন অসিত ও কি একেবারেই লেখাপড়া করবে না বলেছে? মাথা কাৎ করল অসিত, না ঠিক তা নয়। তবে সব সময়ে কি যেন চিন্তা করে। আমার সাথে ঠিকমত কথাও বলে না—এড়িয়ে চলে।

—মাষ্টার মিথ্যে বলেনি। আই থিঙ্ক্ ইট্ প্রপার টু কনসাল্ট উইথ মিঃ গুপ্ত; সুধাংশু সিগারেট টানতে টানতে বললেন।

স্ত্রী উত্তর দিলেন, নট নেসেসারিলী—সবুরে মেওয়া ফলে।

—সবুরে মেওয়া ফলে—নো, নেভার। তুমিই শেস পর্য্যন্ত ভরাডুবি করবে; এবার সুধাংশুর আক্রোশ ফেটে পড়ে; তোমার ইচ্ছা অখিলের সাথে ওর বিয়ে হোক, না?

স্বামীর ক্রোধে সুরূপাদেবী বিচলিতা হলেন না। খুব সংযতভাবে উত্তর দিলেন, মন্দ কি—তা ছাড়া অখিলও এম. এ. দেবে।

হাতের সিগারেটের টুকরোটি এ্যাসট্রেতে চেপে নিভিয়ে রেখে সুধাংশু উত্তর দেন, শুধু এম. এ. দিলেই হোল? লীনাকে হ্যাপি করবার মত তার এমন কি ক্ষমতা আছে?

—বিয়ের মাপকাঠি শুধু টাকা, লেখাপড়ার কি কোন দাম নেই?

স্ত্রীর কথার জবাব দিলেন সুধাংশু, গভর্ণমেণ্ট প্লীডার সুধাংশু সেনের মেয়েকে বিয়ে করতে হলে টাকা চাই। প্রচুর টাকা। আমার মেয়ে পরের বাড়ী গিয়ে ঘর-সংসারের নিত্য কাজ করবে না জেনো। ও তৈরী করবে নিউ ইডেন অব্‌···সুধাংশুর কথা শেষ হবার আগেই অসিত পালাবার চেষ্টা করল।

—তুমি চলে যাচ্ছ যে অসিত? অসিতকে বসতে বললেন সুরূপা।

—আরে বস। অমি এখুনি মিঃ গুপ্তকে ফোন করে দিচ্ছি টু সি মি এ্যাট ওয়ানস্‌।

সুধাংশু টেবিলের উপর থেকে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিলেন; হ্যাঁ এখুনি। টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখলেন সুধাংশু।

আর কালবিলম্ব করলেন না সুরূপা। স্বামীর বন্ধুর মর্য্যাদা রাখবার জন্য অন্য ঘরে চলে গেলেন জলখাবারের প্রারম্ভিক বন্দোবস্ত করতে।

সুধাংশু অধীর আগ্রহে ঘরের ভেতর পায়চারি করতে লাগলেন। দেয়ালের ঘড়িতে পেণ্ডুলাম দুলছে—গভর্ণমেণ্ট প্লীডার সুধাংশুর বুকের ভেতরেও। নিজের সমাজে তার সম্মান, মর্য্যাদা সব কিছু রয়েছে। একটিমাত্র মেয়ে। তাকে মনোমত পাত্রস্থ করতে পারবেন না এ তিনি ভাবতেই পাবেন না। অতএব···

সুরূপা ঘর থেকে চলে যাবার পরেই অসিত উসখুস করতে থাকে সুধাংশুকে কিছু বলার জন্য।

সুধাংশু বুঝতে পেরে প্রশ্ন করলেন, কিছু বলবে নাকি?

—আজ্ঞে বলছিলাম—কথা বলতে যেয়ে অসিতের গলা থেকে কথা বের হতে চায় না। সুধাংশু আবার একটি সিগারেট জ্বালিয়ে টানতে থাকেন। একটু পরেই ফিরে এলেন সুরূপা।

—সব ঠিক আছে ত? প্রশ্ন করলেন সুধাংশু।

সুরূপা খোলা চাবির রিংটাকে বাম হাতে ছুঁড়ে ডান হাতে লুফে উত্তর দিলেন, লীনা বললে তার শরীর ভাল নেই।

সুধাংশু চট্ করে ফিরে দাঁড়ালেন, আচ্ছা।

বাইরে মোটর থামার শব্দ হোল। তিনি তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন। সুরূপা আর দাঁড়ালেন না। দরজার পর্দ্দা সরিয়ে চলে গেলেন।

ঘরে প্রবেশ করলেন অতুল গুপ্ত। অতুল গুপ্তকে দেখে সুধাংশু বেশ সপ্রতিভ হয়ে উঠলেন।

—গুড্ ইভনিং মিঃ সেন ; অতুল আসন গ্রহণ করলেন।

সুধাংশু বল্লেন, প্লিজ টেক ইওর সিট—আই অ্যাম কামিং জাষ্ট নাও। ভেতরকার বন্দোবস্ত পরিদর্শন করবার জন্য অতুল গুপ্তকে সহাস্য নমস্কারে বসতে অনুরোধ জানিয়ে সুধাংশু চলে গেলেন। কি একটা কাজে লীনা এসে সেখানে নিতান্ত আচমকাই হাজির হোল। মাকে সে খুঁজছিল বিশেষ কি এক প্রয়োজনে। মায়ের খোঁজে এ-ঘরে ঢুকতেই চোখ পড়ল অতুল গুপ্তর দিকে। বল্ল; —ও আপনি!

অতুলের কাছে কেমন দুর্বোধ্য ঠেকল ব্যাপারটি। তিনি প্রশ্ন করেলেন, আই মিন্——তুমি——তুমি জান্তে না আমার আসার কথা।

লীনা তার ত্রস্ত গতি সংযত করে উত্তর দিল, না—

অতুল একটু বিস্মিত হলেন। ও আই সি। কিন্তু তোমারই ত' আগে জানবার কথা।

খাবারের প্লেট হাতে চাকর এল। টেবিলের উপর খাবারের প্লেটগুলো সাজিয়ে রেখে চাকর চলে গেল। সুধাংশু অঙ্গুলি সঙ্কেত করলেন অতুলকে।

অতুল বল্লেন, কি হে—লীনা নাকি কিছুই জানে না।

সুধাংশু ঘাড় বেঁকিয়ে মেয়ের দিকে চেয়ে থাকেন।

লীনা ফুলদানির ফুলগুলি নূতন করে সাজাতে সাজাতে বলে ; সত্যিই জানতাম না। আমি না জানলেও কোন ক্ষতি নেই। আপনারা সব কিছু। আমি নিমিত্ত মাত্র।

—কি জানতিস্ না রে লীনা, বলতে বলতে এসে ঢুকলেন স্বরূপা।

অতুল বল্‌লেন, আমার আসার কথা লীনা নাকি জানত না।

স্বরূপা যেন একটু অবাক হলেন।

—সে কি মা। লীনার মনে হোল তার অজ্ঞাতে কি যেন ঘটতে যাচ্ছে। একটু রাগ হোল তার। সত্যিই তো তাই, জানিই না, আর তা ছাড়া জানবার অবসরও হয়নি।

লীনা উত্তর দিয়ে অসিতের দিকে তাকায়।

অসিতের মনে হোল লীনা তার সমর্থন চাইছে। তাই সে বলে বসল, নিশ্চয়ই। ঠিক বলেছ তুমি।

স্বরূপা হাত নেড়ে অসিতকে থামবার জন্য ইঙ্গিত করলেন,—সব কাজে মাষ্টারী বুদ্ধি চলে না।

অসিত নিভে যায়। অপ্রত্যাশিতভাবে ঘা খেয়ে সে মুখ বন্ধ করল।

সুধাংশু বললেন, হ্যাঁ সব বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা ঠিক নয় মাষ্টার—ওতে বুদ্ধির তারিফ করা যায় না—লোকের কাছে ঠক্‌তে হয়।

অতুলের সম্মতিলাভের আশায় সুধাংশু তাকালেন। খুব আগ্রহ সহকারে অতুল অদ্ভুত পরিস্থিতির রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য এদের বাক্য বিনিময় গুলি গিলছিলেন।

সুধাংশুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি এবার জলখাবারের দিকে মন দিলেন।

একটি চপ মুখের মধ্যে পুরে তিনি বললেন, হ্যাঁ হে লীনা যেন কেমন। ওকে তো মোটেই আমাদের সমাজের একজন বলে মনে হচ্ছে না। বেখাপ্পা মতন ঠেকছে। আমাদের যেন ওর...

অতুলের কথার মাঝখানেই লীনা উত্তর দেয়, না ঠিক কথা বললেন না। আমার সব ভাল লাগে। লাগছে না শুধু এই বিচার সভার বিচার।

সুধাংশু মেয়ের দিকে কঠোর দৃষ্টি হানলেন। বন্ধুর সামনে মেয়ের এরকম স্পষ্টোক্তি তিনি আশাই করেন নি।

সুধাংশু চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন; অর্থ? তোমার সম্মান বজায় রাখার জন্যই আমাদের এই প্রচেষ্টা, বুঝলে লীনা?

লীনার সমগ্র চেহারায় এক আসন্ন ঝড়ের সংকেত। বুকের ভেতরে পুঞ্জীভূত বহু প্রশ্ন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। জীবনের সেরা সমস্যার মুখোমুখি এসেই সে দাঁড়িয়েছে। সমাধান অসম্ভব নয়, সহজও নয় অবশ্য, কিন্তু ব্যর্থতার মরুভূমিতে দাড়িয়ে ওয়েসিসের দিকেই চোখ মেলে তাকিয়ে বলে, সম্মান—যে মানুষ কোনদিন ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল না, মানুষের মাঝে যাচাই করল না তার হৃদয়ের ঐশ্বর্য—চিরকাল ফ্যানের তলায় নীলাভ বৈদ্যুতিক আলোয়, কফির পেয়ালায় এবং ডিনার প্লেটে নিজের চেহারা দেখল তার সম্মানের কথা বলছ? ও তো নিজেদের কাছে।

—মানে? এত বড় সেন পরিবারের কারও সম্মান নেই, সুধাংশু প্রশ্ন করলেন।

—আছে। তবে ড্রয়িং রুমের বাইরে নয়। বাইরের লোকের সাথে মেলামেশা না করলে প্রকৃত সম্মান কোত্থেকে আসবে বলো?

লীনা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। স্বরূপা চুপ করে বসেছিলেন। আড়মোড়া দিয়ে তিনি এবার গুপ্তের শরণাপন্ন হলেন। অতুল সমস্ত ঘটনা শুনে একটু থামলেন। তারপর ভ্রূ কুঞ্চিত করে নিজেকে যেন ভীষণ চিন্তার মাঝে ডুবিয়ে উত্তর দিলেন, আছে। খুব ভালো ছেলে আছে। ধনে মানে রূপে অপূর্ব।

সুধাংশু লাফিয়ে ওঠেন। মেয়েকে শাসন করবার জন্য তাঁর পিতৃত্ব উদগ্র এবং সক্রিয় হয়ে ওঠে,—কে? তিনি প্রশ্ন করলেন।

অতুল মুখ ভালো করে মুছে চশমা পড়ে নিয়ে বললেন,—মিঃ সমর সেনের কথাই বলছি—দি সন অব্ এ জমিনদার।

সুধাংশু একটা সিগারেট দিয়াশলাইয়ের উপর ঠুকতে ঠুকতে বললেন, এক্সেলেন্ট ; স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, কি বলো ?

একখানি খোলা টাইম টেবিল হাতে লীনা ফিরে এল।

সুরূপা মেয়ের দিকে তাকিয়ে মনে মনে চমকে উঠলেন, তবু জিজ্ঞাসা করলেন,—কি হোলো—টাইম-টেবিলে কি দেখছিস ? তাঁর জিজ্ঞাসায় ফুটে উঠল এক অজানা আশঙ্কা।

ঘরের সকলেই অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে লীনার দিকে তাকালেন। টাইম-টেবিলের খোলা পাতাটির উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখে লীনা তার হাত ঘড়ির দিকে তাকায় আর আপন মনেই বলে ওঠে, সময় হয়ে গেছে—একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম।

লীনা ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে কাউকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কেউ কথা না বললেও অসিতের বুদ্ধি হঠাৎ চাগা দিয়ে ওঠে, সে বলতে দ্বিধা করলনা ; এ্যাঁ, কি দুঃসাহস।

অতুল চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমার মেয়ে দেখছি একেবারে ওভার ফরোয়ার্ড—এই তো দরকার—বুঝলে সুধাংশু।

সুধাংশুর সমস্ত উৎসাহ মিইয়ে গেল।

অব্ কোর্স—। বললেন সুধাংশু।

কিন্তু তোমার যেন মনে থাকে। অতুল বলতে বলতে ঘর থেকে সোজা বেরিয়ে মোটরে চাপলেন এবং মোটরের দরজা দিয়ে বাইরের দিকে মাথা গলিয়ে বললেন, বাই বাই। সুরূপা খানিকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকলেন।

হাতের সিগারেট দূরে নিক্ষেপ করে সুধাংশু বললেন, আজ বিকেলেই সমর সেনের খোঁজে বার হতে হবে।

স্বরূপা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। অসিত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। সুধাংশু তার দিকে চেয়ে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে তার বুদ্ধি এখনও পাকে নি।

নয়

বেলা বাড়ে নি। বাড়ীতে একটি ঘরের মধ্যে অখিল তার নিজের জামা কাপড় গুছিয়ে নিচ্ছিল। সামনে পুরানো সুটকেশ। অখিলের মা উষা সজল নয়নে ছেলের দিকে তাকিয়েছিলেন। অক্ষয় রায় একখানা পঞ্জিকা হাতে ঘরে প্রবেশ করলেন। অখিল মুখ তুলে একবার তাকাল। উষা ঘোমটা আরও একটু টেনে নামালেন। পঞ্জিকা দেখছিলেন অক্ষয়। তিনি বললেন, তা হ'লে এগারটা পঞ্চান্ন মিনিটেই যাত্রা করতে হবে—এ ছাড়া ভালো সময় নেই। অখিলের সুটকেশ ধরে উষা বললেন, এখনো ঢের সময় রয়েছে—খেয়ে নে আগে, পরে সুটকেশ গুছিয়ে নিস্।

অখিল প্রশ্ন করল, আমার বিছানা ঠিক আছে মা? উষা হাসলেন; হ্যাঁ-হ্যাঁ সব ঠিক আছে। তোর কিচ্ছু ভাবতে হবে না।

—আচ্ছা দাঁড়াও —একটা মোটা খাতা সুটকেশের মধ্যে পুরে অখিল উত্তর দিল।

ঘরের মেঝেয় যত্ন করে আসন পাতা। অক্ষয় একপাশে টুলের উপর বসলেন। উষা থালা সাজিয়ে নিয়ে এলেন। খেতে বসল অখিল।

ছেলের সামনে ভাতের থালা এগিয়ে দিতে দিতে উষা বললেন একটু হেসে; বিদেশে যাচ্ছিস সাবধানে থাকিস, আর সপ্তাহে দু'খানা করে চিঠি নিশ্চয় দিবি। তা তুই পারবি। মৃদু হেসে তিনি বললেন যা চিঠি লেখা বাতিক তোর, একটু সবুর সয় না।

পঞ্জিকা বন্ধ করে অক্ষয় চলে গেলেন।

ভর্তি দুধের বাটির দিকে তাকিয়ে অখিল বলে, এত তরকারী রেঁধেছ তারপরে আবার দুধ। এদিকে আমার পেট ফুলে জয়ঢাক হবার উপক্রম।

—আজ না হয় একটু বেশী করেই খেলি, তাতে কি হয়েছে? আচলের খুঁট দিয়ে সকলের অলক্ষ্যে উষা চোখ দুটো মুছে নিলেন।

—হবে আবার কি? দুধটা খেয়ে অখিল উঠে পড়ল।

অক্ষয় ঘরে ঢুকে বললেন, এরি মধ্যে খাওয়া হয়ে গেল?

উষা আজ অনেক কথা ভাবছেন। লীনা সেদিনের পর থেকে আর এদিকে আসেনি। লীনা তার সঙ্গে দেখা না করে কোন দিনই যায় না। তাই জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁরে অখিল, আজকাল লীনাকে দেখি না যে, তার কোন খবর রাখিস না নাকি?

গায়ের উপর জামা চাপিয়ে অখিল উত্তর দিল, কেন রাখব না। বেশ দিব্যি আরামে আছে।

উষা বললেন, খাসা মেয়ে। তোর উপর যা টান—কেমন বল্‌ল, মাসীমা, আমিই না হয় অখিলদার সব খরচ বহন করব। আমার ধারণা ছিল, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে কাউকে গ্রাহ্যই করতে চায় না। কিন্তু লীনার ব্যবহারে আমার সে ধারণা ঘুচে গেছে।

অখিল এ কথার কোন উত্তর দিল না। ঠিক সেই সময়েই অক্ষয় রায়ের বাড়ীর বাইরের দরজায় কড়া নড়ে উঠল।

অখিল কান খাড়া করে বল্‌ল, এখন আবার কে এলেন—দেখ ত মা।

অক্ষয় দরজার দিকে চেয়ে রইলেন। দরজা খুলে দিতেই লীনা এসে ঘরে ঢুকল। তার চোখে মুখে বিষাদের ঘনছায়া।

উষা হেসে উঠলেন; ওমা লীনা দেখছি। তোমার কথাই আমরা বলাবলি করছিলাম। অখিলের দিকে তাকিয়ে লীনা মুখ নত করল।

—তুমি বসো মা, ঠাকুরের পায়ের তুলসী নিয়ে আসি। ছেলের মঙ্গল কামনার জন্য দেবতার আশীর্ব্বাদ একমাত্র সম্বল জেনে ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন উষা।

অক্ষয়ও সংগে সংগে অন্য ঘরে গেলেন।

দুকুল প্লাবিয়ে যে বন্যা দেখা দিয়েছিল তাকে বাঁধ দিয়ে রাখবার যত চেষ্টাই হোক না কেন আজ তা ভেঙে পড়ল। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। অজস্র কথা বুকের ভেতর মুখর হয়ে উঠছে দুইটি প্রাণে।

লীনা গাঢ় সুরে প্রশ্ন করল, অখিলদা তুমি যাচ্ছ।

অখিল নিরুত্তর।

লীনা আবার ডাকল, অখিলদা।

এবারেও অখিলের মুখ থেকে কোন জবাব এল না।

সুটকেশ খুলে সে খাতাখানা বের করে রাখল।

লীনার বুকের ভেতর যে আবেগ এতক্ষণ জমে জমে উঠছিল তা হঠাৎ বাধ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে।

অখিলের একখানি হাত হঠাৎ চেপে ধরল লীনা।

লীনার এই অব্যক্ত আকস্মিক উচ্ছাসে অখিল অবাক হয়ে যায়।

লীনা বলে, একটিবার, শুধু একটিবারের জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করো অখিল দা।

অখিল বলল, তোমার আজকের আগমন উদয় না আবির্ভাব বুঝতে পারছি না। প্রচণ্ড হাসিতে সে ঘরখানা কাঁপিয়ে তোলে।

বজ্রকণ্ঠে লীনা বলে, অখিলদা।

আর অপেক্ষা করা যায় না। বেলা দশটা বেজে গেছে। বাড়ী থেকে ষ্টেশন পাকা দেড় মাইল। যানবাহনের সুবিধা থাকলেও ব্যয় বাহুল্যের আশঙ্কায় গাড়ী ডাকার কথা কারো মনেই পড়ে নি।

অখিল উত্তর দিল, তোমার ডালি উজার করে যা ইচ্ছা বলে যাও। আজ আমার যাবার দিনে তোমার সব কথাই আমি শুনব।

—সত্যি বলছ অখিলদা ? আবেগের সুরে লীনার চোখ দুটো চক্ চক্ করে ওঠে।

চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে লীনা আবার বলে, তোমার একটু কষ্ট হচ্ছে না ?

স্তম্ভিত অখিল এক দৃষ্টে চুপ করে থাকে। তারপর গম্ভীর হয়ে বলে, আমায় পরিহাস করছ ?

লীনার ইচ্ছা করে গলা ছেড়ে কেঁদে বুকের ভার হাল্কা করে নেয়। কিন্তু পারে না। অনেক কথাই যে তার মনের ভেতর দোল খেয়ে যায়।

ধীরে ধীরে মুখ তুলে আলতো করে অখিলের একখানা হাত ধরে সে বলে, আজ আমি কত নিঃস্ব—কত অসহায় তা কি তুমি একবার ভেবে দেখেছ ?

যত ক্ষোভ এবং অভিমান থাকুক না কেন অখিলের বুকের ভেতরটাও মোচড় দিয়ে ওঠে। তাই অনেক কথা বলার থাকলেও ক্ষোভ, অভিমান এবং আত্মসম্মানের বাধায় কথার স্রোত আলোড়নের সৃষ্টিই করল, ভেঙ্গে বেরিয়ে এলো না সে আলোড়নে।

অখিল চেয়ার টেনে বসে পড়ল। তার শরীর আরও দুর্ব্বল লাগছে।

বিষন্ন মুখে চেয়ারের হাতলটার উপর নিজের হাত দুটো ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে অখিল বলে ভাববার অবসর তো দাওনি। আমার অপরাধ তোমাদের সমাজের মতন নিজেকে তৈরী করতে পারি নি'—অর্থের প্রাচুর্য আমার নেই। আর সেই অপরাধেই হাওয়া বদলানোর অছিলায় চলেছি বিদেশে তোমার নতুন জীবন যাত্রার উৎসবক্ষণে অমঙ্গলের দূত হয়ে থাকতে চাই না বলে।

অখিলের ইচ্ছা থাকলেও আজ সে হাত ছাড়িয়ে নিল না। ঊষা ও অক্ষয় ঘরে ঢুকলেন।

অক্ষয় বললেন, কিসে যাবি ?

উষা বললেন, ওটা তো সবাই ভুলে গেছে। তিনি তাড়াতাড়ি রাস্তায় কোন গাড়ী যায় কিনা দেখতে গেলেন দরজা দিয়ে উঁকি মেরে।

লীনা বাধা দিয়ে বল্ল, থাক মাসীমা। আমি গাড়ী নিয়ে এসেছি।

উষা যেন হাতে চাঁদ পেলেন। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিনি বল্লেন, লক্ষ্মী মেয়ে, ভালোই হোল।

অক্ষয় সুটকেশ হাতে নিয়ে বল্লেন, তাড়াতাড়ি।

অখিল নতজানু হয়ে মা ও বাবার পদধূলি গ্রহণ করল। উষা ছেলের বুক পকেটে ঠাকুরের নির্ম্মাল্য গুঁজে দিলেন।

অখিলের পেছনে আনতশির লীনা এক পা দুই পা করে চলল। উষা ও অক্ষয় সমস্বরে বলে উঠলেন, দুর্গা শ্রীহরি, দুর্গা শ্রীহরি।

দশ

সন্ধ্যা অতিক্রান্ত। এসেছে রাত্রির ঘন কৃষ্ণ ছায়া। সমর সেনের বাসায় চলছেন সুধাংশু ও অতুল। মোটর ছুটে চলেছে এ্যাসপ্ল্যানেড পার হয়ে চৌরঙ্গী হয়ে সোজা টালিগঞ্জের দিকে। অন্যদিক থেকে চেনা নীল রংয়ের একখানা মোটর আসছিল। কোন একটা ক্রসিংয়ের মুখে লাল সংকেতে মোটর দুটো থামল।

অতুল মোটরের আরোহীকে বেশ চিন্‌তে পারলেন। তিনি হাত ইসারায় মোটরখানাকে থামতে ইঙ্গিত করলেন। সমরের মোটরের সামনে অতুল গিয়ে দাঁড়ালেন। দুজনে ফিসফিস কথা হোল।

All right বলে সমর গাড়ী ঘুরিয়ে নিলেন। দুমুখো মোটর দুখানা একটা ছোট্ট বাংলোর মত বাড়ীর সামনে এসে থামল।

বাড়ীর সামনে কৃত্রিম ফোয়ারা। ফোয়ারার চারপাশ দিয়ে দেশী বিলাতী ফুলের গাছ। তিনজনেই একটি কামরায় এসে ঢুকলেন। মেঝেতে পাতা সুদৃশ্য গালিচা। গদি আঁটা চেয়ারে এরা বসলেন।

একটি সিগারেট বার করে ঠোঁঠের ফাঁকে চেপে জ্বালাতে জ্বালাতে সমর, বললে বসুন।

সমর প্রশ্ন করে, হ্যাঁ কি যেন বললেন অতুল বাবু?

অতুল চারিদিকে চেয়ে উত্তর দিলেন, এ ফ্রেণ্ড ইন নিড্ ইজ এ ফ্রেণ্ড ইন্‌ডিড্।

—এতো চিরকাল সত্য- -কে এ অস্বীকার করবে বলুন, সমর উত্তর দিল।

অতুল বল্লেন, দেন, লেট বডি বি কনেক্টেড উইথ মাইণ্ড। মন যাতে চাঙ্গা থাকে অর্থাৎ ধরুন একা মোটরে হাওয়া খেয়ে যে আনন্দ পাচ্ছিলেন তার চেয়ে পাশে যদি কোন এক সহচরা থাকেন, তার চেয়ে বেশী আনন্দ উপভোগ করতেন না কি?

সুধাংশু পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে সমরের দিকে এগিয়ে দিলেন।

সমর উত্তর দিল, থ্যাঙ্কস্।

অতুলের কথার তাৎপর্য বুঝে হেসে উঠল সমর। সে কলিং বেল টিপতেই একজন ছোকরা এসে হাজির হোল। সমর কি যেন বলল। ছোকরাটি কথা বুঝে নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

সুধাংশুর একখানা হাত ধরে অতুল বল্লেন, ইনি হচ্ছেন আমার বন্ধু মিঃ সেন—গভর্ণমেণ্ট প্লিডার। এর মারফৎ আমার বন্ধুত্বের পরিচয়ও মিলবে; এতটুকু বলেই তিনি সুধাংশুর দিকে হাস্যোজ্বল নেত্রে চাইলেন।

সুধাংশু কোনরূপ কথা বললেন না। সমর একটি চেয়ারে বসল। মাথার উপর যে পাখাখানা ঘুরছিল তার গতি কমিয়ে দিয়ে গেল ছোকরাটি এসে।

অতুল সিগারেট টান্‌তে টানতে বল্লেন, মিঃ সেন এসেছেন উপযুক্ত পাত্রের হাতে তাঁর সুন্দরী মেয়েকে সমর্পণ করতে।

সমর চোখ দুটো টেনে জিজ্ঞাসুপূর্ণভাবে উত্তর দিল, ও আই সি। বেশ তারপর?

—তারপর বুঝতেই পারছেন। আপনার মত একজন ইন্‌টেলিজেণ্ট চ্যাপ আমাদের এ অঞ্চলের গৌরবের বস্তু, উত্তর দিলেন অতুল।

—একটু চিন্তা করে দেখা দরকার। বিয়েটা করব নাই স্থির করে রেখেছিলাম—অর্থাৎ একেবারে যে অনিচ্ছা তাও নয়। আপনি তো সবই জানেন।

—সব জেনেশুনেই যোগাযোগটা ঘটবে এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই আমি এসেছি—আই উড বি সাক্‌সেসফুল ইন দিস্ কেস, আই থিঙ্ক! উত্তর দিলেন অতুল।

ছোকরা এসে খাবার সাজিয়ে গেল। সমর বলল, দেখুন বিলেতে বিয়ের আগে কেমন মেলামেশা অথচ আমাদের দেশে ঠিক তার উলটো।

পরম তৃপ্তির সাথে সুধাংশু ও অতুল জলখাবারের সদ্ব্যবহার করতে লাগলেন। সমর কি যেন চিন্তা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে আপনারা সব জেনে শুনে এসে থাকলে কাজটা হলেও হতে পারে। আমার বাইরে কাজ রয়েছে। আপনারা না হয় অন্য কোনদিন—

সমর সেনের কথা লুফে নিয়ে অতুল বল্লেন, তার জন্য কি? আর একদিন নিশ্চয় আসব। আমাদের পরম সৌভাগ্য, আজ আপনাকে ঠিক ধরতে পেরেছি।

সুধাংশুর বুক ফুলে গেল। আধুনিক তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায়ের জয়ধ্বজা আজ তাঁর করায়ত্ত। অদূর ভবিষ্যতের গৌরবময় অধ্যায়ের কথা স্মরণ করে তাঁরা সমর সেনের বাড়ী পরিত্যাগ করলেন। সমর সেনের মোটর ছুটল রসা রোড ধরে চৌরঙ্গীর দিকে।

গলিত কৃষ্ণবর্ণে সারা আকাশ ঢাকা। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস। কালো রং সারা পৃথিবীতে যেন ছড়িয়ে পড়ছে। দূর চক্রবালে মাঝে

মাঝে বিজলী চমকে উঠছে। খোলা এক জানালার ধারে দাঁড়িয়ে লীনা দেখছিল কৃষ্ণা প্রকৃতির লীলা মাধুরী। লীনার গলায় ব্যথা-বিধুর এক গানের কলি ফিরে ফিরে ধ্বনিত হচ্ছিল। হঠাৎ দমকা ঝড়ো হাওয়া বয়ে আনে ধূলো, আঘাত করে প্রকৃতির রূপে বিভোর চোখে। চোখে আঁচল চেপে সে এসে দাঁড়ায় ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে। চোখে আঁচল চাপা পড়তেই দৃষ্টি তার বহি-প্রকৃতি ছেড়ে অন্তর্পথে গিয়ে পড়ল। সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, বিরাট নদীর প্রচণ্ড জলস্রোতে নোংগরহীন নৌকোর মত তার জীবনতরী ছুটে চলেছে। মন্দ লাগে না। কোথায় গিয়ে যে ভিড়বে কে জানে! তবুও নিরুদ্দেশের পানে এ যাত্রা মন্দ নয়। সীমাহীন অথৈ জলের ভেতর সংগীহীনা এ যাত্রা পথে আনন্দ আছে আকর্ষণ আছে। ভাল লাগছে দেখতে, ভাবতে।

চোখটা কুচকুচ করছে লীনার।

সাফ করতে গেল সে নিজের চোখ দুটো আচল দিয়ে। আঁৎকে উঠল আয়নায় নিজের রূপ দেখে। সত্যিই কি গভর্ণমেণ্ট প্লিডারের রূপসা কন্যা অনেকের দৃষ্টিহরা লীনা! না—না, আপন মনেই প্রশ্ন ক'রে সে তার জবাব পায়। সে ভাবে এতো আলো বুঝি তার রূপের রূপান্তর ঘটিয়েছে।

দেরী না করে সে সব কয়টা বাতি নিভিয়ে দিল। অন্ধকার। একবারে নিভাজ অন্ধকার। এই ভাল। এমনি আধারের মাঝেই তার রূপের সার্থকতা।

সুধাংশু এসে ঘরে ঢুকলেন।

এই আধারের ভেতর ভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছে তোমার! সুধাংশু ঘরের বাতিগুলি জ্বালিয়ে দিয়ে মেয়ের দিকে চাইলেন। তাঁর মনের ভেতর আজ হাজারো বাতির উচ্ছ্বাস। অন্ধকার তিনি চান না, এইমাত্র তিনি প্রচণ্ড আলোয় স্নান করে কৃতার্থ হয়েছেন।

লীনা দুহাতে মুখ ঢাকল। কোন কথা বল্‌ল না।

আনন্দের আতিশয্য চেপে রাখতে সুধাংশু পারছিলেন না। হেসে লীনাকে বললেন, তুমি শুনে নিশ্চয় সুখী হবে, অল সেটেল্ড্‌। স্বামীর পদশব্দ শুনে সুরূপাও এসে ঘরে ঢুকলেন।

তিনি মেয়ের দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরালেন।—কি দেখা হোল, প্রশ্ন করলেন সুরূপা।

গৌরবে ফেটে পড়তে পড়তে সুধাংশু বললেন, নিশ্চয়ই, পরে মেয়ের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, এর পরেও কি বলতে চাও লীনা যার খালি বিদ্যাই আছে টাকা নেই মাথা গুঁজবার ঠাঁই বলতে……

লীনার অন্তরাত্মা হাহাকার করে উঠল। কে যেন হঠাৎ তার চরম দুর্বল স্থানে আঘাত করল।

কঠোর হয়ে সে উত্তর দিল, এত কথা কেন বাবা, কি বলতে চাও

সুধাংশু বল্‌লেন, কি বলতে চাই; একটু থেমে তিনি আবার বল্‌লেন, আই বিয়িং ইয়োর ফাদার—তোমাকে সুখী করবার জন্যই আমার এই প্রচেষ্টা।

লীনা ভ্রূকুটি হানল। উত্তর দিলনা।

সুরূপা চেয়ারে বসে এতক্ষণ সব শুনছিলেন। সোজা হয়ে বসে এবার বললেন, সত্যি লীনা তোমার মনের ভাব বোঝা ভার। জানিস মিঃ সেনের সঙ্গে বিয়ে হওয়া ভাগ্যের কথা। নিজের হাতে এমন কি কুটো কেটে দুখানা পর্যন্ত করতে হবে না। আর ওদের ঘরে গেলে গতর খাটিয়ে কুল পাবি না।

লীনা উত্তর দিল, কিন্তু ভুলে যাচ্ছ মা, আজ কালের গতি কোন দিকে। আমাদের এই নতুন ভাবধারা, আলট্রা মডার্ণ ইজম সব একদিন পথের ধুলোয় মিশে যাবে।

সুরূপা বল্‌লেন, আমাদের সমাজই আজ গোটা পৃথিবীর আকর্ষণ—লোকে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকেই।

বাঁ হাতের তেলোর উপর ডান হাতের মুঠি ঠুকে সুধাংশু বললেন, সার্টেনলি। লীনার দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি দৃঢ়তার সাথে বল্‌লেন, তুমি যাবে শ্বশুর বাড়ীতে কনে' বৌ হয়ে—ঘরকন্নার কাজ করতে—ঘর ঝাঁট দিতে—এ আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পার্ব্বো না।

লীনার সারা শরীরে আগুনের হল্‌কা বয়ে যায়। বলে, মিথ্যে কথা। তোমাদের মেয়েকে পাশ্চাত্য আদর্শে তৈরী করতে গিয়ে আয়া ঝি রেখে পঙ্গু করে দাও তার নিজের সামর্থকে। গাউন, ফ্রক, ববড্ হেয়ার বাঙ্গালীর মেয়েদের মানায় না। বরং বিদ্রূপ করে। তাদের রূপ ফুটে ওঠে সমগ্র সংসারকে একান্ততায় গড়ে তোলায়, সকলকে প্রীতি এবং সহানুভূতিতে স্নিগ্ধ করে তোলায়, আর স্বামীর সহধর্ম্মিনী হয়ে।

সুরূপাও জ্বলে উঠে বল্‌লেন, তবে কি তুমি আমাদের মান সম্মান ডুবিয়ে বাপ-মায়ের মুখে চূণকালি লেপে দিতে চাও?

অভিমানিনী লীনা কয়েক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করে গভীরভাবে। উত্তর দেয়—তোমাদের সম্মানকে আমি ক্ষুণ্ণ করতে পারি না। তোমাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। আমার ভাগ্যে যাই কেন না ঘটুক। লীনা গট্ গট্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুরূপা অকুল সাগরে কুল পেলেন।

সুধাংশু অবশ্য সন্দেহ পোষণ করে বল্‌লেন, আবার যদি—

লীনা দ্রুত আবার ঘরে ঢুকেই সোজা বলে ফেলল, না—বিয়ে করতে পার্ব্ব না। বলেই সে ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

সুধাংশু স্ত্রীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্‌লেন, অক্ষয়বাবুর কাছেই যেতে হবে দেখছি।

সুরূপা বেঁকে বসলেন, কেন যেতে হবে? তিনি তোমার প্রেষ্টিজের কি বুঝবেন?

রেগে সুধাংশু গরগর করে বলে চল্‌লেন, না—না। আমি তাঁর বিরুদ্ধে ক্রিমিন্যাল স্যুট্‌ করব।—তার ছেলে আমার মেয়েকে চুরি করেছে। অতুলকেও আসতে বলে দিচ্ছি।

সুধাংশু টেলিফোনের রিসিভার তুলে ধরলেন। চাকর এসে দাঁড়াল। সুরূপা বল্‌লেন, যা দেরী আছে।

এগার

সকাল বেলা। অক্ষয় রায় বাইরের বারান্দায় খবরের কাগজ পড়ছিলেন। মন তাঁর ভারাক্রান্ত। ঊষা দাঁড়িয়েছিলেন কাছেই। তাঁর চোখে মুখে উদ্বেগের চিহ্ন পরিস্ফুট। স্যানাটোরিয়ামে যাবার পর অখিলের মাত্র একখানা চিঠি পেয়েছিলেন তারপরে আর কোন সংবাদ পান নি'।

একসাথে অতুল ও সুধাংশু এসে প্রবেশ করলেন। তাঁদের আসবার শব্দ শুনে অক্ষয় মুখ তুলে খবরের কাগজখানা হাত থেকে নামিয়ে রাখলেন। অক্ষয় বললেন, বসুন আপনারা—কি সৌভাগ্য আমার আজ সকালেই আপনাদের দর্শন পেলাম। অভ্যাগতদের পানে তাকিয়ে দেখলেন তাঁরা দুজনেই উত্তেজিত।

—না, বসব না, বসতে আমরা আসি নি। সুধাংশু ছুঁড়লেন তাঁর মোক্ষম শেল ; ছেলের উপর আপনার কোন কণ্ট্রোল নেই দেখছি।

অতুল বললেন, বাপ হওয়া সহজ কথা নয়। ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন অক্ষয়। অকস্মাৎ সকালবেলা এঁদের মুখ থেকে এমনি সব কথাবার্ত্তায় যত না বিস্মিত হলেন বিব্রত হলেন ঢের বেশী। অভিভূতের মত তিনি উত্তর দিলেন, আপনাদের কথা কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।

সুধাংশু ও অতুল একসাথে মুখ বেঁকিয়ে বললেন, হ্যাঁ বুঝবেন কোর্টে দাঁড়ালে।

উষা কি যে করবেন বুঝতে পারলেন না। কিন্তু সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন। অক্ষয়বাবু উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখে মুখে উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তা রেখায়িত হয়ে উঠল। বললেন, আমার ছেলে ?

—হ্যাঁ, আপনার ছেলে অখিল।

—তা কি হয়েছে সে ত এখানে নেই।

অতুল একটু শ্লেষের সাথে বললেন, হুঁ চেঞ্জে গেছে—যত সব নষ্টের মূল !

—নষ্টের মূল ? কি বলছেন সুধাংশু বাবু, অক্ষয়বাবু রুষ্ট হয়ে জবাব দিলেন।

আক্রোশে ফেটে পড়েন সুধাংশু ; হ্যাঁ হ্যাঁ লীনাকে বিদ্যার জাহাজ দেখিয়ে ভুলিয়ে বিয়ে করার মতলব করেছে, লীনাকে আপসেট করে দিয়েছে। তার মান-সম্ভ্রম সবই যেতে বসেছে আজ।

অক্ষয় আবার বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলেন, এমনত শুনিনি কখনও,—অখিল আজ অন্যের মেয়ের মান-সম্ভ্রম নষ্ট করে পালিয়ে গেছে চেঞ্জে। এ যে কল্পনাতীত। পায়ের তলায় মাটি বুঝি সরে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে তিনি বেঞ্চের ওপর বসে পড়লেন। সুধাংশু এবার ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেন ; শুনবেন আর কেমন করে আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের রকমই এই। ডুবে ডুবে জল খায়।

অক্ষয় এবার বেশ রেগে যান। নিশ্চয়ই অখিল কোন ভীষণ অন্যায় করেছে। নৈলে সকালবেলাতেই মান্যগণ্য ভদ্রলোকেরা আসবেনই বা কেন। ছেলের প্রতিও তিনি কোন পক্ষপাতিত্ব দেখালেন না। বাইরের দরজার কাছে কান খাড়া করে উষা সব কথা শুনছিলেন। ছেলের নিন্দায় তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন। তবু তিনি ঘোমটা নামিয়ে শেষকথা শুনবার জন্য দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর দিকে চোখ পড়তেই মাটির দিকে চোখ নামিয়ে নেন সুধাংশু। অতুলের ঠোঁটে কিন্তু শ্লেষের হাসি। তিনি যেন জিতে গেছেন আজ।

শুনলেন তো আপনি—, বললেন অতুলবাবু।

অক্ষয় বললেন, আচ্ছা আপনারা আসুন। ছেলের অন্যায়কে শাসন করতে আমি জানি, পিতৃস্নেহ অন্যায় সহ্য করে না জেনে রাখবেন।

এদিকে লীনা অনেকদিন থেকে অখিলের কোন সংবাদ না পেয়ে উৎকণ্ঠিতা হয়েছিল।

দিন যায়—রাত্রি আসে—ভোর হয়। অখিলের কোন সংবাদ আসে না। লীনা ভাবে; এতটুকু মায়া মমতাও নেই। আপন মনে সে বলেছিল; আচ্ছা দেখাই যাক কতদিন খবর না দিয়ে পারে। অসুস্থ মানুষকে স্বাস্থ্য লাভের জন্যে হাওয়া বদলাতে পাঠাবার মূলে সেও তো একজন। বেদনাবিধুরা হয়ে ওঠে লীনা। তাই এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে সে এসে হাজির হয় অক্ষয় রায়ের বাড়ীতে। বাইরে থেকে ঘরে পা দিয়েই লীনা সবকথা শুনতে পায়। এ আবার কী ব্যাপার। নিঃশব্দে সে ঘরে এসে ঢোকে।

সুধাংশু মেয়েকে এই সময়ে উপস্থিত হতে দেখে রীতিমত বিস্মিত হলেন। স্বার্থ বিড়ম্বিত হবার আশঙ্কায় সুধাংশু উত্তেজিত হয়ে এতকথা বলেছিলেন। মেয়েকে দেখেই হঠাৎ সুধাংশু যেন মিইয়ে গেলেন। কথা ফুটছিল না তাঁর। নিজের সম্বিত ফিরে পেয়ে সুধাংশু অবাক হয়ে বললেন, তুমি এখানে,—মেয়ের দিকে কপাল-কুঞ্চিত করে তাকালেন।

লীনা নিরুত্তর।

অক্ষয় এতদূর রেগে গিয়েছিলেন যে ধারণা করা যায় না। ঊষার দিকে তাকিয়ে সজোরে বললেন, আমার ছেলে হয়ে—বুঝলে আজ থেকে ও আমার কেউ নয়—এ বাড়ীতে তার কোন স্থান নেই। বাইরের লোকজনের সামনে নিজ স্ত্রীর মর্য্যাদা রাখবার কথাও তিনি ভুলে গেলেন। ঊষা আর স্থির থাকতে পারলেন না। নিজের ছেলের চেয়ে সম্মান বড় নয়।

অন্তরের আগুন কতক্ষণ চাপা দিয়ে রাখা যেতে পারে। সে আগুনের শিখা বের হয়ে আসবেই।

অশ্রুসিক্ত নয়নে ঊষা উত্তর দিলেন, আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না, আমার বিনা অনুমতিতে যে এক পা- নড়ে না সে কি কোন অন্যায় করতে পারে! আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

ঊষার কথার ভেতরেই অক্ষয় বললেন, হুঁ-হুঁ সব পারে।

মায়ের মন, সন্তানের অকল্যাণ ভাবে না, কিন্তু স্বামীর এবং অভ্যাগতদের অভিযোগ কী সত্য হতে পারে না।

তবুও ঊষা বললেন, কি যে বলছ ?

—ঠিকই বলছি। প্রয়োজন বোধ কর—তুমি তোমার ছেলে নিয়ে থাক গে।

ঊষার দগ্ধ বুকের ভেতর মায়ের প্রাণ হাহাকার করে ওঠে।

তিনি বললেন, না—না এ আমি কিছুতেই মানাতে পারব না। তার সকল অপরাধের বোঝা আমার মাথায় থাক। আপনারা তাকে ক্ষমা করুন।

উদ্গত অশ্রু আঁচল চাপা দিয়ে ঊষা ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

লীনা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। অক্ষয়ের দিকে তাকিয়ে সে বলল, আপনার ছেলে, আপনি তাকে তিলে তিলে দেখেছেন বড় হতে। অন্যের এক কথায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে একবারও ভাবলেন না আপনি ? পিতৃস্নেহের শাসন ক্ষমতা জাহির করে রায় দিয়ে বসলেন ছেলের ওপর, ধন্য পিতা আপনি! লীনার কথায় শ্লেষ ঝরে পড়ছিল।

—তুমি বলতে চাও কি লীনা—অতুল জিজ্ঞাসা করলেন।

অক্ষয়বাবুকে উদ্দেশ করেই লীনা বলে চলে—দুর্বলের ভালো মানুষী কাপুরুষতা। তাকে প্রশংসা করা যায় না। আপনাদের যে কি বিশেষণ দেয়া যায় জানি না।

—বড় বড় কথা বলছ যে। দিনের পর দিন বাসার মাষ্টার ফেলে অখিলের কাছে ছুটে আসতে না পড়তে। এমন পড়াই পড়েছ যে

অখিলকে নিজে গাড়ী করে চেঞ্জে পাঠিয়ে দিয়ে এলে ; মেয়ের দিকে কটমট করে তাকালেন সুধাংশুবাবু।

লীনার মাথার ভেতর অনেকগুলি কেউটে কিলবিল করে ওঠে। বিষের জ্বালায় অস্থির হয়ে ওঠে সে। এমন সময় অক্ষয়ও সুধাংশুবাবুকে বলে বসলেন, নিজের মেয়েকে আগলে রাখতে পারেন নি ? চিরকাল লোককে অপরাধী সাব্যস্ত করাই তো আপনার পেশা। এ অঞ্চলে আমিও অনেকদিন বাস করে আপনাকে দেখছি।

লীনাই জবাব দিল—কেন অপরাধী সাব্যস্ত করবে না। সাক্ষীগোপাল হয়ে বসে থাকাটা শুধু অন্যায় নয়, অপরাধও। আপনাদের মত বাপের শাস্তি হওয়াই তো প্রয়োজন, বলেই লীনা ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল।

তিনি বল্‌লেন, না—না এ আমি কিছুতেই মানতে পারব না তার সকল অপরাধের বোঝা আমার মাথায় থাক। ঊষা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

লীনা বলে বসল, আপনারা সকলে মিলে একটা লোকের বিচার করছেন যে এখানে উপস্থিত নেই, তারও তো কিছু বলবার থাকতে পারে।

—মুখের বাঁধন বড্ড আল্‌গা হয়ে গেছে দেখছি। সুধাংশু কড়াভাবে বল্‌লেন মেয়ের দিকে চেয়ে।

লীনা উত্তর দেয়, এতকাল বাঁধ ছিল। কিন্তু আজ আর বাঁধ না ভেঙে উপায় নেই—শুধু সাক্ষীগোপাল সেজে বসে থাকাটা অন্যায়ই নয়, অপরাধ। দ্রুত পায়ে লীনা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—দেখলেন ত ? সে যাই হোক আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আপনারা আমার ছেলের সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তাতে আর বিশেষ কিছু শোনবার ইচ্ছা আমার নেই। আর লীনাকেও জানিয়ে দেবেন মরীচিকার পেছনে ছুটলে সে নিজের সর্বনাশকেই ডেকে আনবে। অক্ষয় বাড়ীর ভেতর ঢুকলেন।

সেদিনের পর থেকে কতবার সূর্য উঠল রাত্রির শেষে। পৃথিবীর কত জঞ্জালের অজস্র বীজাণু পুড়ে শেষ হয়ে গেল। কত ক্ষতচিহ্ন রাত্রির প্রলেপে ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গেল। মানুষের জীবনেও সংখ্যাহীন দুঃখ-বেদনার উপশম ঘটল। অখিলের জন্য মন মাঝে মাঝে আর্তনাদ করে উঠলেও সমগ্র বাড়ীর বিরুদ্ধ আবহাওয়ার দুর্বার চাপে সেই আর্তনাদ মিলিয়ে যায়। ক্রমশঃ লীনাও সে আবহাওয়ায় যেন অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

বিয়ের দিন ঠিক হয়ে যায়। জমিদারের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে গভর্ণমেণ্ট প্লীডারের শিক্ষিতা মেয়ের। ঐশ্বর্যের অন্ত নেই, তাই শিক্ষার প্রয়োজন গেছে ফুরিয়ে। লীনার বান্ধবীরা সকলেই ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করল। ভালবাসার মূল্য নেই। হৃদয়ের ক্ষত শুকিয়ে যায়। লীনার এই সৌভাগ্যে তার বান্ধবীরা অভিনন্দন জানিয়ে গেল। কারো কারো কথায় তাদের অন্তরের ঈর্ষা অস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হয়ে পড়ে।

অন্যের ঈর্ষার বস্তু হয়ে ওঠা চারটিখানি কথা নয়। ভালোও লাগে। আর্তনাদ রূপান্তরিত হয় নূতন মুখী আনন্দে।

সারা বাড়ীতে আসন্ন বিবাহের আয়োজন। রং ফিরান হোল বাড়ীর। বিজলীবাতির মিস্ত্রীরা এসে আলোকসজ্জার প্রাথমিক আয়োজন করে গেল।

বান্ধবীরা প্রত্যহ বিকালে আসে আসর জমাতে। লীনার মনের ক্ষত শুকোতে তাদের পেছনে অন্য কারো চেষ্টা নিরপেক্ষ চোখে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সব চাইতে মুখর হয়ে ওঠে অসিত। সুধাংশু সেনদের সমাজের স্তাবক হলো অসিত। তার মাষ্টারীও বুঝি স্তাবকতা। অখিলকে লীনা ভুলে গেছে। তার মনের ভেতর সমর সেনের প্রতি এবং তাদের এই সমাজের প্রতি আসক্তি নিশ্চয় প্রবল হয়ে উঠছে। নইলে কেউ কি এমনি করে এত আয়োজনের সাথে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারে?

অতুল এবার হাসিভরা মুখে সুধাংশুর একখানা হাত ধরে বললেন, দেখলে ত ?

—এবার আমরা নিরাপদ। গভর্ণমেণ্ট প্লিডারের মেয়ে হয়ে—অ্যাঁ তুমি চলেছিলে একজন…

সুধাংশুর কথা শেষ না হতেই অতুল বললেন, থাক থাক ঢের হয়েছে।

বারো

ঘাত প্রতিঘাতের সমস্ত গণ্ডী অতিক্রম করে দিন বয়ে যাচ্ছে এগিয়ে। সুধাংশুর বাড়ীতে বিস্তর লোকজন আসা সুরু হয়েছে অনেকদিন আগে থাকতেই। কি করে কোথায় আলোর মালা দিলে বাড়ীটি দেখতে হবে ইন্দ্রপুরীর মত তার জন্যও গবেষণা চলছে। দক্ষ মিস্ত্রী এসেছে অর্থাৎ রূপ সজ্জাকর। দূর দূরান্তরের নানারকম আশীর্ব্বাণী আসছে প্রতিদিনকার ডাকে। পিয়নের হাতে চিঠির স্তূপ।

শ্রীমতী লীনার পরিবর্ত্তন হয়েছে। আগে ছিল ঘরের ভেতর জানালা ধরে এখন এসেছে খোলা বারান্দায় বাইরের রূপ দেখতে। কলেজের বান্ধবীরাও তাদের কাজকর্ম্ম ভুলে প্রায়ই আসতে থাকে। অন্ততঃ বৈকালিক মজলিসে চায়ের সাথে খাবারের আয়োজন আছে সেজন্য। অসিতের মন খুসীতে ভরে গেছে ছাত্রীর জন্য। নিজের হাতে গড়া। কম কথা নয়। অখিলের বিষয় লীনা ভুলে গেছে—এ কি কম গৌরবের কথা তার কাছে ?

ঘরে ঢুকেই অসিত দেখল লীনা বেশ ভালো করে বেণী ঝুলিয়ে প্রসাধন কার্যে ব্যস্ত। প্রসন্ন হাস্যে সে চেয়ার টেনে বসল। অবশ্য এঘরে প্রবেশের তার কোন বাধাই ছিল না। স্বেচ্ছায় লীনা সে বাধা অপসারণ করে দিয়েছে।

মুখ ঘুরিয়ে লীনা বলল, কখন এলেন—বসুন।

অসিত জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছ?

—খুব ভালো। আচ্ছা আপনিই বলুন ভালো না থেকে কি উপায় আছে? লীনা উত্তর দিয়ে বেণীটাকে খোপায় পরিণত করে একটি ফুল গুঁজে দিল।

অসিত বলে, যোগ্যতা না থাকলে কি আজকাল চলে—

—আমায় বলছেন।

—হ্যাঁ।

—বুঝতে পারছি না।

—বলছিলাম ওই অখিলের কথা। মিছিমিছি সুধাংশুবাবুকে খালি হয়রাণ করলেন। সেটা অবশ্য ভালো। সব কিছুই যাচাই করে নেয়া ঠিক।

একটু থেমে অসিত বলে, আমি ভাবছি এবার আমাব কি উপায় হবে।

লীনা হেসে উঠল। আমাব কিন্তু আপনাকে বেশ লাগে—। এখন ওকথা বলতেও নেই—ওকথা ভেবো না। আমায় শুধু মনে রাখলেই যথেষ্ট হবে উত্তর দিল অসিত মাষ্টার।

—আপনি এত মহৎ জানতাম না বলল লীনা।

অসিত আত্মপ্রসাদে তুষ্ট হয়ে বলে, সত্যি বলতে কি ওই আমার গুণ, সেজন্যে সবাই আমায় ভালবাসে।

—কিন্তু····

আনন্দের আতিশয্যে খেই হারিয়ে অসিত উত্তর দেয়, তুমিও বোধহয়।

—কিন্তু আজ আর অন্য কোন উপায় নেই।

লীনার কাছে এতদিন পর তার প্রাইভেট টিউটরের গোপন কথাটি ঘোষিত হল। লীনা উত্তর দিল; দয়া করে এখন আসতে পারেন। খোপাটিকে একটা কিল মেরে লীনা ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

অসিত স্বগত ভাবে বলল, কি তেজ! অন্য একটি দরজা দিয়ে অসিত যে পথে এসেছিল সেই পথে নামল।

একটু পরে লীনা আবার ঘরে এল। অখিলের একটি ফটো হাতে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ফটোটি জীবন্ত হয়ে যেন তার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে।

আপন মনে লীনা বলল, তোমার সাথে দেখা হবে কিনা জানিনা। দু'ফোটা চোখের জল ঝরে পড়ে অখিলের ফটোর উপরে।

ঝাপসা চোখ দুটো মুছে নিয়ে লীনা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তার মনে কত কথা জাগছে। শৈশব পার হয়ে কৈশোর তারপর উদ্দাম যৌবন। যৌবনের কূলভাঙা স্রোতে ভেসে সে এল অখিলের দৃষ্টিপথে। কিন্তু ···না আর সে ভাবতে পারে না। বিরাট একটা প্রাচীর ঠেলে উঠবার সম্ভাবনা জানতে পেরেও তো সে নিজে কিছুই করতে পারেনি।

ফটোটির দিকে চেয়ে সে বলে, এতদিনে আমার চিঠি হয়ত তুমি পেয়েছ অখিলদা। তুমি কি আসবে না নিজের চোখে দেখতে কি বিরাট আয়োজন। সব আছে তবু কোথায় যেন মস্ত একটা ফাঁক রয়ে গেছে।

সুধাংশু কি একটা কাজের জন্য ঘরের মধ্যে আসছিলেন। মেয়ের কথাগুলো তার কানে যেয়ে পৌঁছল।

তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, চিঠি আবার পায়নি, নিশ্চয় পেয়েছে।

পিতার উদ্দেশ্য লীনা বেশ বুঝতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে সে অখিলের ফটোখানা ব্লাউসের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে চুপ করে রইল। একখানা চেয়ার টেনে সুধাংশু বসে পড়লেন। মেয়ের ভাবান্তর তিনি লক্ষ্য করলেন।

তিনি বললেন, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে গভর্ণমেণ্ট প্লীডারের মেয়ে হয়ে তোমার আত্মমর্য্যাদার কোন জ্ঞান হল না কেন।

শোনো—খুব আনন্দের কথা যে সমর তেমন বেশী কিছু চায় নি। চেয়েছে একখানা রোলস রয়েস কার আর হাজার পাঁচেক টাকার গয়না। তা চাবে বৈকি—। ভেবেছিলুম কারটি না হয় পরেই দেব কিন্তু দেখলাম ওটা তোমাদের একান্ত প্রয়োজন।

তাহলে তো আমার দাম নেই মোটেই। ওই কারটাই আসল— বলেই লীনা ঘর থেকে ক্ষিপ্রগতিতে চলে গেল।

তের

চারিদিকে হৈ হুল্লোড়। বাইরের বাজনার সুরে সমস্ত বাড়ীটা মাতাল। বিবাহ মণ্ডপ। মণ্ডপটির চারিপাশে আম্রপল্লবের পরিবর্তে রং বেরংয়ের ফানুস উড়ছে। লগ্ন রাত দুপুরে। গণ্যমান্য ব্যক্তিরা যথাসময়েই এসেছিলেন। সিগারেটের আর জর্দ্দার গন্ধ সকল গন্ধের উপর টেক্কা দিয়েছে। কর্মতৎপর সুধাংশু তদারক করছিলেন আমন্ত্রিতদের। অনেকেই ভূরিভোজন সমাপ্ত করে নানা উপঢৌকন দিয়ে প্রস্থান করলেন।

একটি ঘরে লীনার রূপসজ্জায় সাহায্যকারিণী তরুণীর দলে ঠাসা। যথাসময়ে লীনার বিয়ে হয়ে গেল। সুধাংশুর ঠাঠ বজায় রইল। লীনা ও সমরকে নিয়ে আনন্দ মুখরিত হয়ে উঠল তরুণীর দল।

লীনা হাসছে। সে হাসিতে লজ্জাও যে নেই তা নয়। তবু মাঝে মাঝে কি এক অব্যক্ত বেদনার আবেগে তার মুখে এসে পড়ে অমাবস্যার ছায়া। কোচের উপর এসে বসল লীনা ও সমর। সমর হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে গেল। অবশ্য তরুণীর দল পরস্পরকে চিমটি কেটে ঘর থেকে পালিয়ে গেল।

সমর আরও পিঠের কাছে সরে লীনাকে বলল, আজ থেকে আমাদের চলার পথ খুব নিকট হয়ে দাঁড়াল। লাজে নত শির লীনা কোন কথা বলল না। সে চুপ করে ঘরের দরজার দিকে চাইল। ভাবল একা ঘরে থাকা এখন ঠিক নয়।

সমরের মুখের দিকে সে অপাঙ্গে চাইল একবার। সমর বলল, ও বুঝেছি—উঠে এসে সে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। লীনা চাইল আড় চোখে। সন্থ বিবাহিত সমরের এতটুকুও লজ্জা হল না সকলের সামনে নিজের নবপরিণীতার সাথে ছুটো কথা বলবার জন্য ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিতে। উস্‌খুস্‌ করে লীনা। ভাবে একদৌড়ে ঘর থেকে পালিয়ে যায়। যেতে পারে না।

দরজা বন্ধ করে এসে সমর বলে—আচ্ছা বলোতো তোমায় কি নাম ধরে ডাকব—লীনা, না শুধু 'লী'।

লীনার নীরব মুখের দিকে চেয়ে সমর ওর হাত ছুটো চেপে ধরল। লীনার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুতেব শক্তি বইতে থাকে—রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে শিরা উপশিরা। আবেশ বিহ্বল হয়ে আসে চোখ ছুটো।

সমর বলে, কাল ছুপুরেই আমাদেব যেতে হবে। দেরী করে লাভ নেই। তোমার জন্য পথ চেয়ে অনেকেই বসে আছে—বিশেষ করে আমার লেডী ফ্রেণ্ডস্‌—আই মিন বান্ধবাব দল। একটা সিগারেট ধরিয়ে সমর ক্রমাগত টানতে থাকে।

লেডী ফ্রেণ্ডস্‌ আই মিন বান্ধবী···কথাটা লীনাকে যেন চাবুকের ঘা মারল। না—না সে কি ভাবছে······এযে তাহলে,··· অনলের শিখা হয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে আব পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবে সব। মনের এই বিরুদ্ধ চিন্তাকে চাপা দেবার জন্যে লীনা সমরের কাছে ঘনিয়ে আসে। কৃত্রিম আবেগে সমরের হাতও চেপে ধরে।

সমর বলতে থাকে, খুব সুন্দর হবে লী—লেডী ফ্রেণ্ডসদের দেখলে পরে তুমি প্রশংসা না করে পারবে না। উৎসুক হয়ে উঠবে তাদের সঙ্গে আলাপে পরিচয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার জন্যে।

প্রণয়মুগ্ধ সমর বলল, আচ্ছা লী—আমি ছাড়া অন্য কাউকে জীবনের সাথী পেলে তুমি কি সুখী হতে পারতে? অব কোর্স নট—মানুষের জীবনে ঐশ্বর্য্য আড়ম্বর না থাকলে যে সবই ব্যর্থ।

রাত্রিদিন দৈন্যের মাঝে কাটিয়ে তাদের সবই যে শুকিয়ে যায়। কি বিরাট আমাদের এই সমাজ আর তার মেয়েরা—সাইকলজী ষ্টাডি করে মেয়েদের মন জানতে আমায় খুব বেগ পেতে হয় নি।

কোচের উপরই লীনা মনে মনে উদ্ধত হয়ে ওঠে। তার মাথার ভেতর ঝিমঝিম করতে থাকে। হয়ত এখুনি পড়ে যাবে। অতি কষ্টে সে কোচের উপর একখানা হাত রেখে নিজেকে সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে উত্তর দেয়, একটু চুপ করো—খুবই ক্লান্ত লাগছে।

সমর উত্তর দিল, মোটেই অস্বাভাবিক নয়। চলো না দেখবো কত বিশ্রাম তুমি করতে পার। কারণ কি জানো, সকাল দশটায় বের হয়ে আব রাত এগারোটার আগে আজ পর্য্যন্ত বাড়ী ফেরবার অবসর আমার ঘটেনি। এই অনুপস্থিতির মাঝে তুমি বেশ বিশ্রাম উপভোগ করতে পারবে।

লীনার কেঁদে উঠতে ইচ্ছা করে। বিশ্রাম মিলবে। অথচ মুখর দিনের আস্বাদ থেকে সে হবে বঞ্চিত। কি নিয়ে সে থাকবে—একক বিশ্রাম সে চায় না। সমরের সান্নিধ্যেই সে বিস্মৃতির এবং মিলনের সৌধ রচনা করতে চায়।

আশ্চর্য হয়ে সে জিজ্ঞাসা করে, এত রাত করে তুমি বাড়ী ফের ?

—হ্যাঁ। ক্লাবে ও মজলিসে আমাকে যেতে হয়। ওরাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

—ক্লাব মজলিস ওরাই তোমায় বাঁচিয়ে রেখেছে ?

—হ্যাঁ, লী।

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে লীনা উত্তর দেয়, ও… !

ঘরের ভেতর এক কোণে বরণডালায় পঞ্চপ্রদীপের দীপশিখাগুলো যেন স্তিমিত হয়ে আসছে।

হঠাৎ দরজার কড়া নাড়বার শব্দ শুনে লীনা এসে দরজা খুলে দিল।

সুধাংশু ও অতুল ঘরে প্রবেশ করলেন। লীনার মাথায় একটু ঝাঁকুনি দিয়ে অতুল বললেন, কেমন···

সুধাংশু চাইলেন সমরের দিকে।

অতুল আবার বললেন, চমৎকার মানিয়েছে। হ্যাঁ, বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চেয়েছিল অখিল—আরে বাবা—।

সুধাংশু বললেন, ওসব থাক ; এখন চলো কিছু মুখে দেবে।

সুধাংশু ও অতুল ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

অখিলের নামটি সমর বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনল।

ঘর থেকে ওঁরা বেরিয়ে যেতেই লীনাকে সে প্রশ্ন করল, আচ্ছা লীনা অতুলবাবু কার কথা বললেন যেন ?

মুখখানা নীচের দিকে নামিয়ে লীনা উত্তর দিল—আমার এক বন্ধু।

বিস্ময়ের সাথে সমর প্রশ্ন করে, কৈ এমন কারও সাথে আলাপ হয়নি ত—কাজে ব্যস্ত রয়েছেন বুঝি ?

অনেক কথাই লীনার মনে পড়ে। ভাবে, সব খুলে বলে দেয় সমরকে—তা হ'লে যদি বুক হাল্কা হয়ে যায়। মিথ্যা একটা কুয়াসার জালে আত্ম গোপন করে থেকে লাভ কি। এখন সে পরস্ত্রী পরপুরুষের কথা চিন্তা শুধু নয়, মুখে আনাই পাপ।

যুবক সমর, তার জীবনেও কি মরুভূমির মত সে ঊষর করে দেবে। এলোমেলো চিন্তায় লীনার সব গোলমাল হয়ে যায়।

লীনা আঁচল দিয়ে চোখ ঢেকে ফেলে উত্তর দিল, ওকথা থাক, তোমার সাথে তাঁর দেখা হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভব নয়।

—কেন লী··· ?

—সে প্রশ্নের জবাব দেবার সময় এখনও হয়নি, তাই·।

অন্যদিকে লীনা নিজের মুখখানা ঘুরিয়ে নিল।

স্ত্রীর বন্ধু, অথচ সে নাম বলতে এমন কি সে প্রসঙ্গ উত্থাপনেও ইতস্ততঃ করছে লীনা। মুহূর্তের জন্য দুশ্চিন্তার একটি হালকা মেঘ সমরের মনে মুখে ছায়া ফেলে উড়ে চলে যায়। সে বলল, বন্ধু

থাকা বিশেষ করে মেয়েদের পুরুষ বন্ধু থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক; তাতে দোষও নেই। সবাই সমান এই ত যুগধর্ম্ম। এ এমন কিছু বিচিত্র নয়।

লানার বুকের হাড়গুলো গুঁড়ো হয়ে যায়; শান্তির নীড় রচনা করবার আগে এসব যেন কোন এক কাল বৈশাখীর অশুভ সঙ্কেত। সমরের কথার জবাব দেবার আগেই সুধাংশু, অতুল ও সুরূপা একযোগে ঘরে এসে ঢুকলেন। লীনা ঘরের এককোণে সরে গিয়ে চুপ করে দাঁড়াল।

বিজয়গৌরবের হাসিতে ঘরখানা মুখর করে অতুল বললেন, ধীরে, ধীরে।

লজ্জায় মাথা হেঁট করে লীনা। সমর উত্তর দেয়, না এমনি।

অতুল বললেন, এমনি নয় সমরবাবু এমনি নয়।

গলার মালাখানা বিছানার উপর খুলে ফেলে সে সন্তর্পণে তার গিলেকরা পাঞ্জাবীর আস্তিন দুটো কব্জি থেকে—একটু তুলে রিষ্ট-ওয়াচে সময় দেখে চমকে উঠল।

রাত অনেক হয়েছে। এত রাতে খাওয়া দাওয়া করলে শরীর খারাপ হতে পারে ভেবে সুধাংশু বেশী পীড়াপীড়ি করতে না চাইলেও সুরূপার অনুরোধে সমর বেশী নয়—দুটো সন্দেশ দুটো রসগোল্লা আর পোয়াটেক দৈ খেল। লীনা অবশ্য এপথ গ্রহণ করল না।

সে সোজাসুজি মায়ের সাথে বাইরে চলে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

মেয়ের আদিখ্যেতা দেখে সুরূপা বললেন, নে হয়েছে। যা প্যারিস দুটো খেয়ে নে, মিছিমিছি দেরি করিস নে। রাত করলে আবার তোদেরই অসুবিধা।

যে কয়জন তরুণী আড়িপাতার জন্য অবশিষ্ট রয়েছিল তারাও চোরা দৃষ্টি হানতে লাগল। অগত্যা সকলের কথার উত্তর না দিয়ে লীনা খাওয়া সেরে শোবার ঘরে এসে ঢুকল।

পরের দিন। রোলস রয়েস মোটরের উজ্জ্বল চকচকে রং অনেকের কাছে বেশ আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়াল। সুধাংশু ঘরে ঢুকে সমরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বল্‌ল, সব রেডী—এবার···।

বাক্স প্যাঁটরা মালপত্তর মাথায় নিয়ে চাকরবাকররা অন্য একটি লরীতে মাল বোঝাই করল। পথচারী অনেকেই থ' হয়ে দাঁড়াল ক্ষণিকের জন্য সুধাংশুর বাড়ীর সামনে।

যাত্রার সময় হয়ে এল। দেরী করে কিছুই লাভ হবে না ভেবে লীনা বাপ মায়ের পদধূলি নেবার কাজটা আগেভাগেই সেরে নিল।

ব্যাণ্ড বাদকেরা অনেক আগে থাকতেই ধীরে ধীরে যে সুরের সৃষ্টি করছিল এবার তা উঠল উচ্চগ্রামে। অসিত অনেকক্ষণ ধরে চেয়েছিল আনমনে। লীনার সাথে আবার কবে দেখা হবে কে জানে। আর যাই হোক মাসের শেষে পঞ্চাশটি টাকার শোক সে ভুলতে পারল না। পকেটের রুমালে সে তার চোখ ছুটো পুছে নিল।

অতঃপর বিপুল হর্ষধ্বনি ও তুমুল শঙ্খনাদের ভেতর রোলস রয়েস ছুটল সমরের বাসার দিকে। সেখানে অনেক তরুণী—অনেক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাদের বেশভূষায় চলচ্চিত্রের অভিনেত্রীদের রূপের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল স্বরূপকে আবডালে রেখে রংচং মেখে। অনেকের মাথায় ঘোমটার বালাই নেই—সতীসাধ্বীর চিহ্ন একবিন্দু সিঁদূর দেখা যাচ্ছে না।

লীনা ধীরে ধীরে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

অভ্যর্থনা জানাল মেয়ের দল হাল ফ্যাসানের ভঙ্গিতে করমর্দনের সাথে। অস্বস্তিকর এক আবহাওয়ায় লীনা ক্ষুব্ধ হোল। এতটা সে আশা করেনি।

মেয়েদের মধ্যেই একজন একটু সেকেলে ধরণের মহিলা এগিয়ে এলেন। লীনার শুভ্র কপালের দিকে চেয়ে হা করে তাকিয়ে বললেন, একি গা—একেবারে সাদা ধব্‌ধব করছে যে।

পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা লীনা নববধূর মতই মুখ লুকিয়ে রাখল।

উত্তর দিল একজন ধিঙ্গি তরুণী, কি যে বলছ মাসীমা তোমরা একেবারে অচল।

মহিলাটি উত্তর দিলেন, তা যা বলেছ।

চৌদ্দ

বিয়ের কয়েক হপ্তা লীনার মন্দ কাটল না। সকাল বেলা থেকেই নবাগতা মেয়েদের ভিড় — ত রকম কথা কেউ কেউ, মনে হোল, কত রাত থেকেই এখানে ছিল। এমনিই বুঝি থাকে। বাড়ীতে আত্মীয় স্বজন কারো কোন সাক্ষাৎ নেই। একটু যেন অদ্ভুত লাগল। কিন্তু দিনও কেটে যেতে লাগল। লীনার ভালোই লেগেছিল। অতীত এসে তাকে অস্থির করে তোলে নি আর। কেটে যেতে লাগল দিন হাসি ঠাট্টায়, আমোদ আহ্লাদে।

সখ করে লীনা আপন হাতে সমরের শোবার ঘরখানা সাজায় আপন মনে প্রতিদিন। কি আর করবে? সময় আর কাটতেই চায় না। কতক্ষণই বা মেয়েদের সাথে আবোল তাবোল কথা বলা চলে। প্রত্যেকের কথাতেই এত বড় জমিদার গিন্নী হওয়া যে কত বড় সৌভাগ্যের কথা তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একজন বর্ষিয়সী প্রতিবেশিনী এসে বললেন, একটু ভালো মত থেকো, সমরের রাত্রে দেরি করে বাসায় আসাটা কমাতে চেষ্টা করো।

সুধাংশু ও অতুল একসাথে কয়েকবার এসেছেন। নানা উপদেশ দিয়ে গেছেন তাঁরা। অতুলবাবু তো একবার খাপছাড়া ভাবে বল্লেন, সমরের যা কাজ তাতে রাত্রে দেরীই হয় খুব, না? জবাবের অপেক্ষা না রেখেই বলেছিলেন, বাইরে তার বেশ হাঁক ডাক। নানা জায়গায় নানা কাজ।

লীনা ভাবে কি যে অন্যায় তার হচ্ছিল। প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তার মন অস্থির হয়ে ওঠে। সমরের বুকের ভেতর মুখ লুকিয়ে একেবারে তার সাথে মিশে যেতে চায় সে। কিন্তু উপায়

নেই। সে যা চায় তা পায় না। বাড়ীর বাইরে রোলস রয়েসের হর্ণ বেজে ওঠে শহরের স্তিমিত প্রায় যানবাহনের কোলাহল ছাপিয়ে গভীর রাতে।

লীনার চোখে নেমে আসে ঘুম-অঘোর ঘুম—সারাদিনের নিঃসঙ্গ জীবনের ক্লান্তির শেষে একটুকু সুখ। তবু তার ভাল লাগে সমরের চেহারার দিকে চেয়ে। কি সুন্দর জামা কাপড়ের চেকনাই—মাথার চুলগুলো কেমন লোশন দিয়ে আঁটা,—চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা।

এমনিভাবেই সময় কাটে। লীনা ভাবে এত কি কাজ সমরের। তার কাজের লাঘব সেও তো করতে পারে তার অংশীদার হয়ে। এ কথা সে সমরকে নিশ্চয়ই বলবে আজ হোক কিম্বা কাল।

প্রজাপতি ঋষি ডানায় ভর দিয়ে এসেছিলেন, না তাঁকে করায়ত্ত করে আনা হয়েছিল তা বিচার করবার সময় আসতে খুব দেরী হোল না।

ক্রমাগত নিঃসঙ্গ জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে লীনা যখন তার সব কিছু উজাড় করে দেবার জন্য সমরের প্রতীক্ষা করছিল তখন একদিন অনেক রাতে সমর এসে সটান বিছানায় ঢলে পড়ল।

মোটর থেকে চাকর এসে তাকে শুইয়ে দিয়ে গেল বিছানায়। ঘুমন্ত লীনা কিছুই জানতে পারেনি—অনেক কিছু নিরুক্ত ভাষা জমে তার বুকটা শুধু ফুলে উঠেছিল। সমরও তা দেখতে পায়নি। দেখলে পরে হয়ত লীনাকে সে আদর না করে পারত না।

আরেক দিন। তন্দ্রার সাথে রীতিমত যুদ্ধ করে লীনা অনেক রাত অবধি জেগে রইল। চাকর এসে খাবার ঢাকা দিয়ে চলে গেল। বাইরের মৃদু গ্যাসপোষ্টের" আলোয় জানালার পাশে এসে দাঁড়াল লীনা। নিজের অজ্ঞাতসারে তার চোখ ছাপিয়ে জল এল। জানালার শিক ধরে সে দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করল দু একটি গানের কলি গুন-গুনিয়ে।

ভোঁ-ভ্যাঁ। রোলস রয়েস এসেছে। বিশ্রী শব্দ। এত রাতে এরকম শব্দে সত্যই লীনা আঁৎকে ওঠে। চাকর এসে সমরকে দোর গোড়ায় এগিয়ে দিল। সমরের সমস্ত শরীর তখন কাঁপছে। টল্‌তে টল্‌তে সে টাল সামলে নিল দেয়াল ধরে। রক্তিম চোখে জানালায় দণ্ডায়মানা লীনার দিকে তাকিয়ে সমর বলল কে—এত রাত অবধি জেগে আছ যে, কোনো নতুন বন্ধুর জন্যে বুঝি। জড়িত তার কণ্ঠস্বর। লীনার শরীর কেঁপে উঠল, কোন কথা বলল না।

বিছানার উপর সমর কাৎ হয়ে বসে ডাকল, মাই ডালিং ফরগেট মি নট। সঙ্গে সঙ্গে বমি। সেদিন ক্লাবের বন্ধুদের সাথে যেটুকু পান করেছিল সব একেবারে উগড়ে উঠে এল।

লীনা ভয়ে জানালার কাছ থেকে বিছানার কাছে এসে সমরের মাথা তুলে ধরল। এত রাতে কাকেই বা ডাকবে। আতঙ্কে বিহ্বল লীনা এদিক সেদিক করতে থাকে। হঠাৎ সে ছুটে যায় দরজার পাশে তেপায়াটার কাছে। ওই ত টেলিফোন রয়েছে। আর দেরী নয় এক্ষুনি ডাঃ সরকারকে একটা আর্জেন্ট কল। সমর জড়িতকণ্ঠে ডাকে, নীড নট বি অ্যাফ্রেড্ মাই লী···ওটা কিছু নয়—আঁৎকে উঠেছ···এ্যাঁ!

লীনা আবার কাছে এল সমরের। কিসের গন্ধ? এক নিমেষে তার সমস্ত কল্পনা—সমস্ত আশা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। নিজের হাতে সাজানো ঘরখানা যেন তাকে বিদ্রূপ করছে। টবের ফুলগুলোর ভেতর থেকে অসংখ্য কীট যেন আত্মপ্রকাশ করল। সুধাংশু এসে দেখুক লীনা কি সুখেই না আছে। আসুক অতুল গুপ্ত তার দালালীর ফল দেখতে। লীনা ত তৈরী হয়েই আছে।

সমর বল্‌ল, সিট ডাউন—

—ষ্টুপিড

—হোয়াট ষ্টুপিড—জানো···

—হ্যাঁ জানি।

—আই অ্যাম রিয়েলি ভেরী সিরিয়স, সমর ঐ অবস্থাতেই কোনরকমে দাঁড়িয়ে লীনার একখানা হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল।

হাতের কাছে কোন এক ধারাল ছুরিও নেই, তাহলে লীনা তার স্বামীর কোন একটা বড় আর্টারি কেটে রক্তের নদী বইয়ে দেয়। সমর বলে, কি দেখছ লী? ঘুমুও গে, ভেরী নাইস স্লিপ।

চোখ দুটো বড়ো করে লীনা বলে, আপন মনে উঃ কি সর্ব্বনাশটাই বাবা করেছেন।

—কি বলছ ওসব। সব শুনছি আর বুঝতেও পারছি কিন্তু। মত্ত সমর বলতে থাকে।

সাধে কি তোমায় বিয়ে করেছি বাবা একেবারে কড়কড়ে টাকাগুলো যখন পকেটে এল তখন কোন শালা না বে' করে,—সমর বিছানায় টলে পড়ল। বিছানার বালিশ ভিজে গেল লীনার চোখের জলে। সে ফুঁপিয়ে উঠল। কিন্তু বৃথাই এ রোদন। সাহারায় শুকিয়ে যায়।

সমর মাথা কাৎ করে লীনার দিকে চেয়ে বলল, কাঁদছ কারে— কি হয়েছে?

—কি আর হবে—কি বাকী রেখেছ। আমি না তোমার স্ত্রী— সে কথা কেন ভুলে যাও!

রাত বেশী হলেও আরেকখানি মোটর সেই সময়ে সমরের বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়াল।

চাকর এক কোণে ঘুমুচ্ছিল। তাড়াতাড়ি বাইরের বাতির সুইচটা টিপে দিল। একজন তরুণী নেমে এল। পাঞ্জাবী ড্রাইভার এক ঝলক হেসে মোটর ফিরাল। এমনি কত তরুণীকেই সে এ বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে গেছে। দরজার কলিং বেল বাজতেই লীনা দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল, কে···? তার চমক লাগে। রাত দুপুরে তরুণী। সমর তখন অনেকটা

সামলে উঠেছে। দরজার দিকে তাকিয়ে সে বলে, ও মিলি এসো-এসো।

লীনাকে ক্ষুদ্র এক নমস্কার জানিয়ে মিলি রায় সমরের দিকে চাইল।

সমর তাকাল। কোন কথা বলতে পাবল না।

লীনা খুব কড়া ভাষায় জিজ্ঞাসা করল, এত রাতে আপনি ?

সমর বিছানায় উঠে বসল, ইউ সাট্ আপ।

--মুখ সামলে কথা বল, লীনার চোখ দিয়ে আগুনের শিখা ঠিকরে বেব হয়ে আসে।

লীনাকে ধরবার জন্য সমর উঠে আসতেই মিলি রায়ের গায়ে টলে পড়ল।

মিলি রায় দুহাত দিয়ে সমরকে ধরে বলল, দেখুন সমরবাবুর দিকে একটু তাকান।

—তার জন্য আপনার উপদেশ দেবার প্রয়োজন নেই মিলি দেবী।

মিলি রায় হাসল। সারা ঘরখানায় কা বিশ্রী অবস্থা।

লানা তাড়াতাড়ি টেলিফোনের কাছে ছুটে গেল। সমর এসে লানাকে আঘাত করে বসল। মূর্চ্ছিতা লীনা ঘবেব মেঝেয় পড়ে গেল।

লীনার দিকে চেয়ে মিলি রায় বল্‌ল, ওর চোখে মুখে একটু জল দেবেন না ?

মিলি রায়কে বাহুতে জড়িয়ে একটু চাপ দিল সমর, আপনিই উঠে পড়বে—এসো। খিল খিল হেসে উঠল মিলি রায়, আপনি বড়······

সমর উত্তর দিল, হ্যা আমি বড় ইয়ে এবং সেজন্যেই তুমিও আজ এত রাতে আমার পেছু নিয়েছ। ভেবেছিলাম ক্লাব থেকেই বিদায় নেবে ; সমর ভ্রূকুটি হানল। মিলি রায় দূরে সরে দাঁড়াল। লীনার ভূলুণ্ঠিতা দেহের দিকে চেয়ে সমর হেসে ওঠে, খেলার পুতুল···

মিলি রায় এক পা দুই পা এগিয়ে এসে দরজা দিয়ে বাইরে পা বাড়াল। সমর তার পেছন নিয়ে বলল, দাঁড়াও, তোমার পুরস্কার···

—না থাক—সন্তর্পণে ফটকের দরজা পার হয়ে মিলি রায় অদৃশ্য হয়ে গেল। জ্বালিয়ে গেল আরেকটি মনে আগুনের তীব্র শিখা।

জমাট আঁধারের বুক চিরে ভোরের আলো আসবার সাথেই ভূলুণ্ঠিতা লীনা চোখ মেলে তাকাল। উঠে এসে সে খাটে বসল। মুখ ঘুরিয়ে সমর বলল, আজ বিকেলে বেড়াতে যাবো।

লীনা কোন উত্তর দিল না। সে যেন অতীতের কোন এক দুঃস্বপ্ন থেকে উঠে এসেছে। সমর আবার বলে,···· ·মনে থাকে যেন।

চাকর এসে প্রাতরাশ দিয়ে গেল।

রাতে যেখানে পড়ে গিয়েছিল সেখানে একটা বিশ্রী দাগ তখনও রয়েছে। সমর ঐ দাগের উপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল।
নিজের মনে হয়ত সামান্য ভাবান্তর তার ঘটেছিল। চাকরকে ডেকে বল্‌ল, এখুনি ঘরখানা ধুয়ে দে—তোরা যে কি হয়েছিস।

সমর বার হয়ে গেল। লীনা দেখল রজনীগন্ধা শুকিয়ে ঝরে পড়েছে। বৃথা জল দিয়ে তাদের আর বাঁচান যাবে না।

পনের

স্বাস্থ্যনিবাস থেকে অখিল ফিরছে—হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে। তার মনে কত আনন্দ—কত কল্পনা। ষ্টিলের স্যুটকেসের ভেতর সযতনে অনেক জিনিসপত্র বোঝাই করল। অনেকদিন পর্যন্ত মাকে চিঠি লিখে সে কোন জবাব পায় নি। তাতে তার মন সামান্য সন্দেহাকুল হয়েছিল। একবারমাত্র সে অসিতের একখানি চিঠি পেয়েছিল। চিঠি পাবার পর অখিল খুব হেসেছিল। তাকে নাকি ত্যাজ্যপুত্র করা হয়েছে। অখিল মনে ভেবেছিল যার বিয়ে তার হুঁশ নেই—পাড়া পড়শির ঘুম নেই। খুব রসিয়ে উত্তর দিয়েছিল ;

আপনার চিঠি পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি। মায়ের ওটা রাগ নয় অপার স্নেহ।

ট্রেণ তখনও গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছয় নি। আরো চার-পাঁচটি ষ্টেশন অতিক্রম করতে হবে। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। জানালা দিয়ে মুখ বের করে অখিল আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে। ঊর্দ্ধশ্বাসে ট্রেণ ছুটে চলেছে। অখিলের কি আনন্দ। তার মনে হয় আজ যেন সে নূতন জগৎ দেখতে চলেছে। সে জগতে মানুষেরা কত খুসীর নেশায় ভরপুর।

সুধাংশু শুধু বিস্মিত নয় আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। সটান লীনা ঘরে ঢুকেই কেঁদে ফেলল।

কড়—কড়, কড়াৎ—। বাজ পড়েছে কোথাও। আকাশ ভরা মেঘের ভেতর বিজলীর ভীষণ দমক। স্বরূপা জানালার সাসিগুলো চট্‌পট্‌ করে বন্ধ করে দিলেন।

হাতের সিগারেটটাকে অ্যাসট্রের মধ্যে ফেলে দিয়ে সুধাংশু ভয়ার্ত্ত চোখে বললেন, তোর টেলিফোঁ পেয়ে আমরা ত ভেবেই অস্থির। কি ভয়টাই না হয়েছিল।

স্বরূপা বল্‌লেন, তা কি আর বল্‌তে এখনও আমার বুকের মধ্যে গুরগুর করছে।

নিজেকে ধাতস্থ করে সুধাংশু হেসে বল্‌লেন, বুঝেছি। তোর মনের মতন করে নিতে যত গোলমালের সৃষ্টি। ও মন কষাকষি একটু আধটু হয়েই থাকে। পরে ও সব ঠিক হয়ে যায়।

একটু চিন্তা করে সুধাংশু আবার বল্‌লেন, তা ছাড়া মন কষা-কষির বা এমন কি ঘটেছে। দিব্যি আরামে মোটরে বেড়াবি···

স্বরূপা বল্‌লেন, সমর বুঝি কাল রাতে বাড়ী ফেরেনি—সুধাংশু এবং স্বরূপা হঠাৎ যেন শরাঘাতে আহত হলেন। লীনা এবার তার চোখ দুটো মুছে নিল। তার সারা শরীর বিষের জ্বালায় জ্বলছে। বাবা ও মাকে কিছু বলতে গিয়ে তার বুক যেন ঢিব্‌ ঢিব্‌ করছে—

দম বন্ধ হয়ে আসছে—গলা পর্য্যন্ত কি যেন ঠেলে উঠছে। এত সাধ আহ্লাদ করে সমরের সাথে বিয়ে দিয়েছেন সুধাংশু।

সুধাংশু নিস্তেজকণ্ঠে বল্‌লেন, বের হই আবার বাবাজীর খোঁজে···

সুরূপা উত্তর দিলেন, তোমার একটুও বুদ্ধি নেই। ভেতর থেকে একজন দাসী এসে ঘরে ঢুকল, মা একটু ভেতরে আসবেন।

—সব সময় আমায় কেন—তোরা এতদিনে কি শিখলি? দাসীর পেছনে সুরূপা রান্না-বান্নার বিলি ব্যবস্থা করে দেবার জন্য অন্য ঘরে চলে গেলেন। সুধাংশু ঘর থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি স্নানের পাটটা সেরে ফেলবার জন্য বাথরুমে ঢুকলেন।

সমর বাড়াতে ফিরে চাকরের কাছ থেকে যখন জানতে পারল লীনা বাপের বাড়ী চলে গেছে তখনই তীব্রবেগে মোটর ঘুরিয়ে গভর্ণমেণ্ট প্লাডার সুধাংশু সেনের বাড়ার দিকে সে রওনা হল।

সমরকে ঢুকতে দেখেই লানা চমকে উঠল।

সে সমরের হাত থেকে নিজেকে এবং বাপ মাকে বাঁচাতে বেপরোয়া হয়ে উঠল। সমরের কাছে যেতেই তার মুখনিসৃত তীব্র গন্ধে ব্রহ্মতালু পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেল। লানা করযোড়ে অনেক মিনতি জানাল: ওগো এমনটি আর কোরো না—বাবা মা যদি জানতে পান।

—সেইজন্যে ঘর থেকে পালিয়ে এসেছ; লানার একখানা হাত ধরে সমর এমন হেঁচ্‌কা টান দিল যে দেয়ালে ঠুকে গিয়ে লানার মাথায় লাগল আঘাত।

লীনার অস্ফুট আর্ত্তনাদ শুনে ব্যাকুল হয়ে একযোগে সুধাংশু ও তাঁর স্ত্রী এসে ঢুকলেন।

সম্মুখে সমরকে দেখে সুধাংশু কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়ে বললেন, এসেছ, বাঁচা গেল।

সমর নিজের ভারসাম্য রক্ষা করবার জন্য টেবিলের উপর হাত না রেখে পারল না। কিন্তু তার পা দুটি ক্রমাগত কাঁপছিল।

সমরের এই অবস্থা দেখে সুরূপা দেবী বিস্মিত হলেন দুঃখিত হলেন, কিছু বলতে পারলেন না। বলবেনই বা কি করে? মাথা কাটা যাবে যে—এত ধুম-ধাড়াক্কার সাথে মেয়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে তোলার কামনায় বিয়ে দিলেন। আলোর সমারোহে সকলের চোখে ধাঁধা লাগল। তরুণীর দলে ঈর্ষার সৃষ্টি হোল তার ভাবখানা আমরা কি দোষ করলাম। সুতরাং—তিনি ভয়ে বিমূঢ়া হয়ে রইলেন।

হৃদয়ের মর্মমূলে যেভাবে বেদনা সঞ্চিত হয়ে উঠছিল দিনের পর দিন আজ মা বাপের কাছে লজ্জা ঢাকবার চূড়ান্ত অক্ষমতায় ক্ষোভে সেগুলো রোষে উৎসারিত হয়ে গেল লীনার চোখে এবং মুখে।

লীনা কাঁদতে কাঁদতে বলে, তোমরা তোমাদের আভিজাত্য বজায় রাখলে, আমার সুখ-শান্তির দিকে তাকালে না একবার। ঐশ্বর্য্যের দুয়ারে ভিখিরি সাজালে, যাচাই করলে না বস্তুটি সাপ না ব্যাঙ—মানুষ না ছাগল? আকাশ ভেঙে যেন বর্ষা নামল লীনার চোখে। সুরূপা এসে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন। নারী-জীবনের এ তো আর কম ক্ষতি নয়। সুধাংশুও আজ নিজেকে বিপন্ন বোধ করলেন, বুঝতে পারলেন সমরের আজকের রূপ। বললেন, অত উতলা হয়ো না লীনা, সব দেখছি।

লীনা মায়ের হাত থেকে নিজের হাত মুক্ত করে নিয়ে উত্তর দিল তোমাদের চোখ আর কবে ফুটবে· ·

—দাঁড়াও—দাঁড়াও; সুধাংশু একবার সমর ও আরেকবার লীনার দিকে নিজের হাত প্রসারিত করতে লাগলেন।

ঈশানকোণে যে মেঘখণ্ড শক্তি সঞ্চয় করছিল এতদিন ধরে, আজ হঠাৎ তা রুদ্র মূর্ত্তিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। লীনার চোখে জল, কথায় আগুন। চুলগুলি তার ছড়িয়ে পড়েছে

সারা পিঠে। সমরের দিকে চাইল সে একবার। পৃথিবীর সমস্ত ঘৃণা অগ্নিস্রোতে তার দু'চোখ হতে বেরিয়ে সমরকে যেন ভস্ম করে দেবে। দুঃখে ক্ষোভে তার হৃৎপিণ্ড দুরন্ত তালে উঠানামা করছিল। কিছুক্ষণ থেমে সে আবার বলল, দাঁড়াতে বলছ আমায়, কোথায় দাঁড়াব বল, তোমরা তো যার কাছে দাঁড়াতে পাঠালে ওই দেখ না সে নিজেই দাঁড়াতে পারছে না। আমি চললাম, আমার পথ খুঁজে নেব। তোমাদের আভিজাত্যের দুর্গে তোমরা চূড়ান্ত অশান্তি নিয়েও আত্মরক্ষা করো। বলেই ছুটে বেরিয়ে গেল লীনা। সুরূপা ধরতে গেলেন মেয়েকে। তার আগেই লীনা বেরিয়ে গেছে পথের বুকে।

ষোল

শহরের পথ। সুষুপ্তির কোলে বিরাট নগরী। পথের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে পাহারাদার। দূর থেকে ছুটে আসছে একজন রমণী। পাহারাদার বাঁশী বাজিয়ে তাকে থামবার জন্য ইঙ্গিত জানাল।

রমণীটি পাহারাদারের নিষেধ অগ্রাহ্য করে ছুটে চলল। এ পথে কে তাকে বাধা দেবে। হৃদয়ের আলোকে আলোকিত এ পথ। এক টুকরো মেঘ এসে তাকে ঘিরে রেখেছিল মুহূর্তের জন্য। সে মেঘ সে নিজেই উড়িয়ে দিয়েছে, আবার সে চলেছে তার চিরচেনা পথে।

একজন সার্জেণ্ট মেয়েটির সুমুখে এসেই তার মোটর সাইকেল থামিয়ে দিল। রমণীটি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটুখানি ভেবে নিয়ে সে আবার ছুটবার চেষ্টা করল। পাহারাওয়ালা ইতিমধ্যে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। রমণীটি থেমে গেল। পাহারাদার ছুটে এসে দাঁড়াল রমণীটির সামনে।

লে যাও থানা মে, বলতে বলতে সার্জেণ্ট তাঁর নোট বুকে কি টুকে নিল।

রহস্যময়ী রজনীর বুকে পাহারাদারের সঙ্গে রমণী ধীরে ধীরে গলির ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

*　　*　　*　　*

অখিলের মনে হয় ট্রেন যেন আর পৌঁছবে না। আকাশের বুকে ঘন ঘন বিজলীর চমক। সুরু হোল ঝম ঝম্ বৃষ্টি। সূচীভেদ্য অন্ধকারের ভেতর গাড়ী ছুটছে। বহু ষ্টেশনে অতিরিক্ত সময় থেমে থেমে বার বার বাঁশী বাজিয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়েরও তিন ঘন্টা পরে গন্তব্য স্থলে ট্রেণখানা যখন এসে পৌঁছল তখনও মুষলধারে বৃষ্টি পরছে।

ষ্টেশন থেকে বাড়ী খুব দূর না হলেও কমও নয়। অখিল চিন্তায় পড়ল। শেষ বাসখানাকে সে ঠিক ঠাহর করতে পারছিল না। ভিজে একশা হয়ে কোন রকমে বাসের ভেতরে গিয়ে সে দাড়াল। বাসের ভেতরে জল আসছে। ঠাণ্ডা যেন তার হাড়ের ভেতর অবাধ কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে। বাস থেকে নেমেও তাকে হাঁটতে হবে। ভিজা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ষ্টিলের স্যুটকেশ হাতে করে বহু পরিচিত এক গাড়ী বারান্দার নীচে সে এক মুহূর্ত্তের জন্য থমকে দাড়াল। এ রকম বৃষ্টি সে জীবনে দেখেনি। রাস্তাগুলোয় যেন ভগীরথ স্বয় গঙ্গা আহ্বান করে এনেছেন। সে নিজের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। ভিজতে ভিজতেই সে কড়া নাড়ল। কারো কোন সাড়া শব্দ নেই, ক্রমাগত ধাক্কা মেরে অখিল একবার মা, একবার বাবা কতবারই না ডাকল সাড়া পেল না। গভীর ঘুমে অচেতন অক্ষয়ের হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে ঊষা বললেন, অখিলের গলা না।

বিরক্তির সাথে অক্ষয় উত্তর দিলেন, ছেলের কথা ভেবে ভেবে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, শুয়ে পড়। অক্ষয় ঘুমিয়ে পড়লেন। ঊষার চোখে ঘুম নেই। তাঁর মনের ভেতরও ঝড়।

অভিমানের অশ্রু ঝরছে অঝোর ধারায় অখিলের। তার হাতের টিনের বাক্স পড়ে গেল দরজার সামনে। অসিতের চিঠি তবে মিথ্যে নয়। অখিল ভাবে, কিন্তু তার মাও কি সন্তানের কথা সত্যিই ভুলে গেছেন—কি অপরাধ তার।

তবু কাতর কণ্ঠে বারবার ডাকছিল,—মা, মা—। অখিলের কাতর আহ্বান বাইরের বৃষ্টির জলে গলে গলে ভেসে গেল।

সমুদ্রের বুকে নিমজ্জমান জাহাজের যাত্রীরাও তৃণ খণ্ড আঁকড়ে বাঁচবার চেষ্টা করে থাকে। গত্যন্তর না দেখে অখিল তাড়াতাড়ি পা বাড়াল গভর্ণমেণ্ট প্লীডার সুধা গুপ্তের বাড়ীটির দিকে। দু তিনটে বাড়ীর পরেই।

লীনা হয়ত আজো তার কথাই ভাবে। আজ রাতের মত সেখানে যদি একটু আশ্রয় মেলে। সর্বাঙ্গ সিক্ত জলে লীনার স্মৃতি-পটে আজো বেঁচে থাকার কথা ভাবতে অখিলের সমগ্র অন্তর আনন্দের বন্যায় ভেসে গেল।

অনেক ডাকাডাকি করেও সুধা গুপ্তের বাড়ীর ভেতর থেকে কারও সাড়া পাওয়া গেল না। সেনবাড়ীর সবাই তখন তো লীনাকে ধরে আনবার জন্য বেরিয়ে পড়েছেন। অখিলের সমস্ত পথ তাহলে আজ রুদ্ধ। অখিল ভাবছে এই কি জীবনের যাত্রাপথে তার অবশ্য প্রাপ্য ছিল।

হঠাৎ তার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। কি ভেবে অতি সন্তর্পণে লীনার ঘরের জানালার সামনে গিয়ে সে দাঁড়াল। ঠিক তক্ষুনি পুলিশ এসে সন্দেহভরে তাকে ধরে নিয়ে গেল।

উষা ওদিকে স্বামীর অগোচরে একবার দরজা খুলে বাইরের দিকে তাকালেন। বৃষ্টি ধরে এল প্রায়। স্বামীকে ডেকে তুলবার জন্য উষা স্বামীর গায়ে হাত দিলেন। অক্ষয় পাশ বদল করলেন। মায়ের মন কিছুতেই মানে না। উষা বিছানায় বিনিদ্রনয়নে আবার শুয়ে পড়লেন। কিন্তু চোখে ঘুম আসে না। অকারণে একটা চাপা

কান্না ঠেলে উঠতে চায়। এমন তো প্রতিদিন ঘটে না। তাঁর সামনে চোখের উপর দিয়ে কিসের এক ছায়ামূর্ত্তি যেন ছুটে চলে গেল।

তিনি না উঠে থাকতে পারলেন না। দরজা খুলে পা বাড়াতেই একটা বাক্সে পা ঠেকতেই তিনি বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠলেন। তাঁর সন্দেহ তবে ঠিকই। অখিল এসে চলে গেছে। তার ছেলে চলে গেছে। ভাবলেন অক্ষয়কে ডেকে বলেন। কিন্তু···না—না—থাক; তিনি একাই যাবেন ডাকতে। দরকার কি স্বামীকে জানিয়ে, আগে কতবারই তো বলেছেন, ওগো অখিলের উপর থেকে তোমার ধারণা পাল্‌টে নাও—লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিয়ো না। বলা নেই কওয়া নেই একজনের কথায় বলে দিলে সে আমার কেউ নয়। বাপ বলেই পারলে—মা তা পারে কি? তাব যে নাড়ীর টান। টিনের সুটকেশটি তুলে নিয়ে উষা পথের উপর নামলেন।

বৃষ্টির জলে পিচ্ছিল পথ। উষা ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে ত্রস্ত পায়ে পথ চলছেন। হাতে বোঝা। পা পিছলে পড়ে যাবার আশঙ্কা প্রচুর। তীব্র শব্দে মোটরের হর্ণ বেজে উঠল, একেবারে পিঠের উপর। আতঙ্কে তিনি বেসামাল হয়ে পড়ে গেলেন রাস্তায়, পড়েই অজ্ঞান। মোটরখানা তীব্র বেগে নিজেকে বাঁচাবার জন্য পালিয়ে গেল। পাহারাদার অবাক। মহিলাকে ওঠাতে গিয়ে মোটরের নম্বর নিতে পারল না পাহারা-ওয়ালা। থানায় নিয়ে যাওয়া তো চলে না। অকর্মণ্যতার নজির থেকে যাবে, কি যে করবে তাও ভেবে পাচ্ছিল না। এমন সময় হঠাৎ সামনে এসে থামে একটি পুলিশের গাড়ী। উষাকে তুলে নিয়ে চলল থানায়, তারপর অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

থানার সব ইন্সপেক্টর দাশু সরকার ডায়েরী লিখছিলেন।

অখিলের দিকে ক্রোধে চেয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, তা হ'লে আপনার নাম—

গম্ভীরভাবে অখিল উত্তর দিল, হ্যাঁ আমার নামই অখিল রায়।

দাশু সরকার কলম চালিয়ে চললেন।

—পেশা ?

—এম. এ. পাশ করে আপাতত বেকার।

—বুঝেছি, দাশু সরকার সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হঠাৎ গভীর রাতে গভর্ণমেণ্ট প্লীডার সুধাংশু সেনের বাসায় চুরি করবার মতলব হয়েছিল কেন ?

বিস্ময়ে অখিল অবাক। হায়রে পোড়া কপাল ?

অখিল উত্তর দিল, কি বলছেন—চুরি ? চোর আমি নই—কথ্খনই না।

অপর একটি কনেষ্টবলের রেগুলেশন লাটির দিকে অখিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাশু সরকার বলেন, সাধুতা রেখে এখন সত্য কথাটা বলো দেখি।

অখিলের চোখ ছাপিয়ে জল আসে। বলে, বিশ্বাস করুন—আমার —আমার······।

—হ্যাঁ বলে ফেল—ইতস্তত করছ কেন ? দাশু সরকার টেবিলের উপর রুলের শব্দ করলেন কয়েকবার জোরে জোরে ঠুকে।

একজন কনেষ্টবল এসে ঘরে ঢুকল—তার পেছনে সেই রমণীটি।

দাশু সরকার মুখ তুললেন। কনেষ্টবলটি সোজা দাঁড়িয়ে একটা সেলাম ঠুকল। দাশু সরকার বিস্ময়ে তাকালেন। অখিল মাথা নত করে স্বল্প জীবনের হিসাব নিকাশের কথা ভাবছিল। মুখ তুলে সে চেঁচিয়ে উঠল।

পৃথিবী যেন দুভাগ হয়ে গেছে। তার মাথার ভেতরের শিরা উপশিরাগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল। একি স্বপ্ন না সত্যি ! এত বড় অভিজাত বংশের মেয়ে—সেও আজ থানার কবলে !

বিস্ময়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে অখিল প্রশ্ন করল, লীনা তুমি ?

বহু পরিচিত স্বরের আভাষ পেয়ে লীনার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ—হতবাক।

হতবাক দাশু সরকার। কনেষ্টবলটি মূক। দাশু বারবার তাকাচ্ছেন এদের দিকে। আরেকজন কনেষ্টবল এসে থানায় ঢুকল—কোলপাঁজা একজন রমণী। দাশু সরকার রীতিমত ঘাবড়ে গেছেন—একসাথে এতগুলো ডায়েরী তৈরী করতে হবে।

মা—আমার মা, অখিল তাড়াতাড়ি ঝাঁপিয়ে পড়ল মার বুকে; দারোগাবাবু দয়া করে একটু জল দিন—ওই দেখুন এখনও সামান্য জ্ঞান রয়েছে—

—মাসীমা—এঁ্যা। লালা বসে পড়ল উষার পায়ের কাছে।

দাশু সরকারের আজ কি হোল! পাষাণের বুকেও মমত্ব বোধ রয়েছে। বহুকাল তিনি আইনের দরবারে রয়েছেন। কত মানুষকে দেখেন—বিভিন্ন চরিত্রের কত রূপ তিনি এঁকেছেন তার ডায়েরীতে। আর আজ!

দাশু সরকারের চোখের কোণেও জল। তার খোলা ডায়েরীর অসম্পূর্ণ পাতা বাতাসে উড়তে থাকে।

--o--